শ্রীবাসব

মণ্ডল বুক হাউস : ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯শে আষাঢ়, ১৩৭১ সাল

প্রকাশক
শ্রী সুনীল মণ্ডল,
৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রী গণেশ বসু।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রী বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭।এ, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯।

পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ—

আমার পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথ দেবের

পুণ্য স্মৃতিপূজায়—

সংকলয়িতার স্বীকৃতি

মহাকবি গিরীশচন্দ্র লিখেছেন :

"কহে শুভ্র কেশ শিরে এই তো রে শমন ধরিল আসি।

যেতে হবে। করো এবে পাথেয় অর্জন।"

আমার শুধু শুভ্র কেশ নয়। বার্ধক্য, জরা ও ব্যাধি একসঙ্গে সমস্বরে তাগিদ দিচ্ছে যেতে হবে। যেতে হবে। যেতে হবে। কর এবে পাথেয় অর্জন।

হায়! হায়! করে কপাল চাপড়ানো ছাড়া কোন সঞ্চয় তো আমার নেই। এই দীর্ঘ পরমায়ু পেয়ে এই দীর্ঘদিন আমি করেছি কী? অনু-স্মৃতির পুচ্ছ-তাড়নে বিপর্যস্ত হয়ে উঠলুম। কেমন করে পার হব এই দুস্তর পারাবার? ঠাকুর! রক্ষা করো! রক্ষ গোবিন্দ! আমার মত পাতকী পাষণ্ডীকে কে উদ্ধার করবে?

স্মরণে এলো পতিতপাবন গৌর-গোবিন্দের মহিমা! যিনি জগাই-মাধাইয়ের মত পাষণ্ডদের ভব বন্ধন মোচন করেছিলেন একমাত্র সেই অবতাররূপী শ্রীভগবান নিতাই-গৌরই পারেন কৃপা করতে। অমন দয়াল ঠাকুর তো আর নেই।

আবার লেখবার প্রেরণা এল। এক অদৃশ্য মহাশক্তি আমাকে জোর করে লিখতে বসাল। নতুনতর লেখা। লেখার মাঝেই খুঁজে পেলাম সাধনার বীজমন্ত্র :

"হরের্নামৈব কেবলম"

শ্রবণে, কীর্ত্তনে, পঠনে ও লিখনে।

শ্রীগৌরাঙ্গের সেই অভয় বাণী প্রতিধ্বনিত হল কানে :

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।

নাম হইতে হয় সব জগত নিস্তার।"

তবে আর ভয় কি?

পথের সন্ধান পেলুম, যা হতে বিঘ্ন নাশ। অভীষ্ট পূরণ।

"হা নিতাই-গৌরাঙ্গ" বলে এখন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে গাইতে যদি ঘুমিয়ে পড়ি তবেই হবে লেখা সার্থক।

কিন্তু সে ভক্তি কই? সে প্রেম কই? লেখার মধ্যে দিয়েই প্রেম-ভক্তির সাধনা করতে হবে। তিনিই দেবেন ভক্তি ও প্রীতি যিনি লেখবার এই রতি, মতি ও শক্তি দিয়েছেন। পিপাসু মন সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষা করবে।

এ রচনা নয়। সংকলন। এর উপাদান সংগ্রহ করেছি শ্রীগৌরাঙ্গের পুণ্য লীলাভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপের পথপ্রান্ত থেকে। শ্রীবাস অঙ্গনের তীর্থরেণু থেকে।

আর সংকলন করেছি নিম্নলিখিত গৌরাঙ্গ সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে:

১। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্যভাগবত।

২। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত।

৩। শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা।

৪। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

৫। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের অমিয় নিমাই চরিত।

৬। রাধাগোবিন্দনাথের চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা প্রভৃতি।

যাঁরা গৌরাঙ্গ লীলামৃত লিখে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা আমার প্রণম্য। তাঁদের পুণ্যস্মৃতিকে আমি প্রণাম করি।

অবতরণিকা

শ্রীবাস অঙ্গন নবদ্বীপধামের গৌরাঙ্গ লীলায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

সেকালে নবদ্বীপ ছিল ভারতের পুণ্যভূমি বারাণসীর মতই বাঙলার ও বাঙালীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাধনার পুণ্যপীঠ। তারই হৃদয়কেন্দ্রে এই শ্রীবাস অঙ্গন। আজো সেই পুণ্যভূমি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ। তীর্থধাম নবদ্বীপের একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। সেই ভূমিখণ্ড শুধু শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণরেণু রঞ্জিত নয়। এর ধূলিকণার প্রতি অণু-পরমাণুতে গৌরাঙ্গলীলার এক একটি অধ্যায় লিখিত আছে। দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর কালপ্রবাহ আজো তা মুছে ফেলতে পারেনি।

আজো সেখানে মহাপ্রভুর "রাঙা পায়ের সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে"।

আজো তার আকাশে-বাতাসে অনুরণিত হয়ে ওঠে তাঁর বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি: হা কৃষ্ণ! হা গোবিন্দ! এখনো তার সন্ধ্যাকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্ত পার্ষদদের সমবেত কীর্তন ধ্বনিতে:

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ। আজো এর ভূগর্ভ হতে উত্থিত

হয়ে দিগমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে ফেলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সিংহনাদ :
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে"।

ব্রজের রজের মতই এর ধূলিকণা পরম পবিত্র ও কৃষ্ণ ভক্তি ও প্রেম বিমণ্ডিত।

এ অঙ্গন নয়। কৃষ্ণ-নাম মন্থন করা এক মহাসমুদ্র।

না। এ অঙ্গন নয়। এ হরিনামেব একখানি আঙরাখা বা নামাবলি। এর আষ্টে পৃষ্ঠে শুধু নাম আর নাম। যে নাম জীবের পরম গতি।

শ্রীবাস অঙ্গনের মাটিতে বসেই মহাপ্রভু কলিহত জীবের জন্য সাধনার নতুন এক পথ আবিষ্কার করেন। তাঁর নামের মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন।

বলেন, নামের মাহাত্ম্যে শ্রবণে ও কীর্তনে লৌকিক সংসারের পাবে যে অনন্ত অলৌকিক অমৃতরাজ্য আছে—সেইখানে পৌঁছান যায়।

বলেন :

"কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সব জগত-নিস্তাব॥"

তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত সেই অমৃতময় বাণী ও মহামন্ত্র আজো শ্রীবাস অঙ্গনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হয়। ভাগ্যবান যারা তাবা আজো শুনতে পায় তাঁর অমৃতময় অভয় কণ্ঠ।

আমরা সেই যুগপ্রবর্তক ভারতীয় সাধনার নতুন পথের স্রষ্টাকে শ্রীবাস অঙ্গনের মাটিতে লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করি।

ধন্য শ্রীবাস পণ্ডিত। ধন্য তাঁর গৃহিণী মালিনী। ধন্য তাঁর আত্মীয় পরিজন। ধন্য তাঁর দাসদাসী। ধন্য তাঁর শ্রীনিকেতন। কে জানে কোন পুণ্যফলে ও কোন সুকৃতির বলে স্বয়ং শ্রীভগবানের সেবার এই পুণ্য অধিকার লাভ করেছিলেন।

বাস পণ্ডিতের মধুর সাহচর্য, তার সংসারের শুচিতা ও ভগবৎভক্তি।

কৃষ্ণ অবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব গৃহে আবির্ভূত হয়ে যেমন বিহার করেছিলেন নন্দের মন্দিরে, তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গদেব জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আবির্ভূত হয়ে লীলা ও বিহার করলেন শ্রীবাস অঙ্গনে।

গৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীবাস অঙ্গন হল তাঁর ব্রজধাম। তাঁর যতেক লীলা ও ঐশ্বর্য মাধুর্য, পরিস্ফুট ও প্রকট হল শ্রীবাস মন্দিরে।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব ও মধুর সাহচর্য, তাঁর পবিত্র সংসারের শুচিতা, শুভ্রতা ও ভগবৎভক্তি তাঁকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করল। তাঁর ভগবৎ বাণী তাঁর কর্ণে মধু বর্ষণ করল। তাঁর কৃষ্ণ প্রীতি তাঁকে মুগ্ধ করল।

একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানের পথে অন্যান্য বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে কিশোর মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হল।

দর্শনমাত্রেই মহাপ্রভু তাঁকে নমস্কার করলেন। ভক্তগণকে প্রণাম করা মহাপ্রভুর বিধি! ভক্তগণ তাঁকে আশীর্বাদ করেন। শ্রীবাসও সেদিন তাকে আশীর্বাদ করলেন:

> "হউক তোমার ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
> মুখে কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে।
> কৃষ্ণ ভজিলে বাপ সব সত্য হয়।
> কৃষ্ণ না ভজিলে রূপ বিদ্যা কিছু নয়।
> কৃষ্ণ সে জগৎ পিতা।
> কৃষ্ণ সে জীবন
> দৃঢ় করি ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ।"

শ্রীবাসের এই শিক্ষা ও আশীর্বাদ তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে রইল। তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিগলিত লোচনে বার বার তাঁর পানে চেয়ে তাকে মনে মনে প্রণাম করলেন। শ্রীবাসের এই কৃষ্ণপ্রীতি ও ভক্তি তাঁর কোমল অন্তরে মুদ্রিত হয়ে রইল।

শ্রীবাসের কৌলিক পরিচয় অজ্ঞাত না হলেও অস্পষ্ট। প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যেটুকু পাওয়া যায় সেইটুকু এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

> "শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
> দুই ভাই দুই শাখা জগত বিদিত॥
> শ্রীপতি শ্রীনিধি তার দুই সহোদর।
> চারি ভায়ের দাসদাসী গৃহ পরিকর॥
> দুই শাখার উপশাখায় তাঁ সবার গণন।
> যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্তন॥
> চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
> গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা॥

মহাপ্রভুই হয়ে উঠলেন শ্রীবাস সংসারের ইষ্ট দেবতা। তাঁর সেবা করতে পেয়ে সকলে ধন্য ও কৃতার্থ হল। তাঁর মন্দিরে নাম সঙ্কীর্তনের আসর বসল।

মৃদঙ্গ, করতাল এল। ভক্তেরা এসে ভিড় জমাল। শ্রীবাস অঙ্গন হয়ে উঠল মহাপ্রভুর নাম যজ্ঞের হোমকুণ্ড।

অভক্ত পাষণ্ডীর দল এলো কৌতুক দেখতে। কৈতব করতে।

সঙ্কীর্তনের মাঝে মহাপ্রভুর আবেশ ও নৃত্য এক অভাবনীয় অলৌকিক প্রকাশ। মরলোকে সে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা।

নৃত্যের ভঙ্গিতে ও তালে বৃক্ষচূড়ায় পাখিরা কূজন করত। আকাশ

বাতাস সঙ্গীত তরল হয়ে উঠত। সুরধনীতে উজান বইত। অদৃশ্য লোকে বেদধ্বনি হত। অন্তরীক্ষ হতে দেবতারা ভক্তের বেশে আসরে অবতীর্ণ হতেন। অজানা অচেনা কত সৌম্যকান্তি ব্রাহ্মণ গোঁসাই এসে ভিড় করতেন। কে জানে তাঁরা কে বা কারা? শুভ্রকেশ বয়স্থ বৃদ্ধেবা আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে জ্যোতির্ময় দেহ প্রভুর চরণে প্রণত হত।

পরিচিত মুখ দেখলে মানুষ যেমন ভাবে তার পানে তাকায় ঠিক তেমনি চিনি-চিনি ভাবে প্রভু নিষ্পলক নয়নে তাদের পানে চেয়ে তাদের সাদব অভ্যর্থনা জানান। তাদেব সঙ্কীর্তনে যোগদান করতে আমন্ত্রণ কবেন। ব্রহ্মমোহন লীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মাকে বলেছিলেন তেমনি ভগ্নকণ্ঠে অনুযোগ কবেন, "এবা আমায় চিনতে পারে না।

অপরিচিতেরা স্মিতমুখে হাস্য করেন।

মহাপ্রভু তাঁদের কুশল প্রশ্ন করেন। এমন সব প্রশ্ন করেন লৌকিক জগতে যার কোন অর্থ হয় না। যে অদৃশ্যলোকেব তিনি সন্ধান দেন মবলোকে তা অবাস্তব ও অর্থহীন।

আশপাশের ভক্তেরা বাণীহীন বিস্মিত নয়নে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। মহাপ্রভুকে তাদেব দুর্গম ও দুর্বোধ্য মনে হয়।

সত্যই মাঝে মাঝে প্রভু দুর্গম ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন। তখন তাঁকে সমীহ না করে উপায় নেই। এই অটল গাম্ভীর্য আবার [illegible] বিলীন হয়ে যায়। এমনি অট্টহাস্য করে ওঠেন যে সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়। অথচ ভক্তদের অধীন তিনি। [illegible] নির্দেশ ব্যতীত এক পাও চলেন না। ভক্তদের সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি সদাই উন্মুখ ও অতন্দ্র। তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য তিনি সদা ব্যগ্র ও জাগ্রত। তাদের দাসত্ব করবার জন্যই যেন তাঁর অস্তিত্ব।

[illegible] পণ্ডিত বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তার অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও সুহৃদ। তাঁর

কাছে তাঁর গোপন কিছু নেই। মালিনীকে উদ্দেশ করে তার সঙ্গে রহস্যালাপ ও কৌতুক করতেন।

নিজে শ্রীবাসকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন আবার সময়ে সময়ে তার কোলে চরণযুগল স্থাপন করে মৃদু মৃদু হাসতেন।

শ্রীবাস,তাঁর চরণকমলে করস্থাপন করে কৃতার্থনয়নে তাঁকে নিরীক্ষণ করেন।

বিচক্ষণ ভক্তের বুঝতে বাকি থাকতো না যে এ তাঁর প্রকাশ। ভগবান তাঁর মাঝে আবির্ভূত। তিনি নিঃশব্দে নিমীলিত নয়নে প্রণত হতেন।

* দ্বিতীয় পল্লব *

জগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীবাস পণ্ডিত প্রতিবেশী। নবদ্বীপের দু-ঘর গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

দুটি পরিবারে প্রণয় প্রীতি ও ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল। আচারে, অনুষ্ঠানে দুটি পরিবারই সাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাবান শ্রীবিষ্ণুর পূজারী ও ভক্ত। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। তাঁদের খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। উৎসবে অনুষ্ঠানে দুটি পরিবারে প্রীতির আদান প্রদান হত পরমাত্মীয়ের মত।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি হতে শ্রীবাসের ডাক এল।

সপত্নী শ্রীবাস চললেন মিশ্রের মন্দিরে।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করেছেন ঃ

"নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতম হইল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥
সেইকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লইয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্তন রঙ্গে
কেন নাচে কেহ নাহি জানে॥
আচার্য-রত্ন শ্রীবাস, হইল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান করিল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সঙ্কীর্তন
নানা দান কৈল মনোবলে॥"

স্বর্গ হতে দেবীরা, ব্রাহ্মণীর বেশে দর্শন করতে এলেন।

অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব-চারণ
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্যগীত।
নর্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপ যার নাট
সবে আসি নাচে পাইয়া প্রীত॥
আচার্য-রত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র-বাস
আসি তাঁরে করি সাবধান।
"করাইল জাতকর্ম, যে ছিল বিধি ধর্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান॥
সব ধন বিপ্র দিল দান॥
যত নর্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন
ধন দিয়া কৈল সবার মান॥"
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তার মালিনী
আচার্য রত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নানাফল,
দিয়া পূজে নারীগণ সঙ্গে॥"

দুটি পরিবারের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার একটা মধুর সুর ছিল।

নবদ্বীপ তখন আলোড়িত। লোকমুখে একটি মাত্র কথা: তিনি এসেছেন। এসেছেন।

আকাশে বাতাসে, অন্তরীক্ষে ভূতলে সেই অশ্রুতপূর্ব বাণী "তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর কোন ভয় নাই।" লোকে বলাবলি করছে "জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে যাও। দর্শন করে এসো।"

জগন্নাথ মিশ্রের শ্রীনিকেতন হয়ে উঠল শ্রীধাম জগন্নাথ ক্ষেত্র। পুরুষোত্তমের মন্দির।

দলে দলে লোক চলেছে মিশ্রের মন্দিরে। অথচ কেউ জানে না

কেন তাদের এই মহোল্লাস। নবদ্বীপে কসের এই মহোৎসব? কাকে দর্শন করতে তারা ছুটে চলেছে?

নবদ্বীপবাসীরা কী পেয়েছে না জানলেও মনের গভীরে এটুকু উপলব্ধি করেছে যে তারা ধন্য হয়েছে। তারা জীবনের পরমার্থ জানতে পেরেছে। ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন তাদের মাঝে। শান্তিপুরের আচার্য-রত্ন অদ্বৈত ঠাকুর তাঁকে ডেকে এনেছেন।

জগন্নাথ মিশ্রেব ঘরে তিনি এসেছেন। এসেছেন ধর্ম সংস্থাপনার নিমিত্ত।

জনবহুল নবদ্বীপেব পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে সর্বত্র ঐ একটিমাত্র ফিসফিশানি গুনগুনানি। নবদ্বীপ ধন্য হয়েছে। ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে এর দেশবাসী।

গঙ্গার পরপার হতে, গ্রাম ও গ্রামান্তব হতে লোক ছুটে আসছে দলে দলে শিশু ভগবানকে দর্শন করতে।

শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন চলে পুরোদমে।

দিবা দ্বিপ্রহরে কীর্তনান্তে ভক্ত ও সঙ্গীদের সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গাস্নানে যান জলবিহার করতে। কীর্তনের আবেশে ও প্রেমানন্দে তখনও সকলেই বিহ্বল বিভোব ও আত্মহারা। অতি বৃদ্ধ যে সেও জলে নেমে বালকের মত চঞ্চল ও দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। হুড়োহুড়ি মাতামাতি, জল ছোঁড়াছুঁড়ি করতে থাকে। মহাপ্রভু গদাধরের অঙ্গে জল ছিটিয়ে দেন।

পরমানন্দে ব্রজলীলার মত গৌবাঙ্গদেব জলকেলি করেন সুরধনী জলে। নিতাই জলে নেমে অদ্বৈত আচার্যের গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে দিতে তাঁর সঙ্গে কপট কলহ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মধ্যস্থ হয়ে তাদের কলহ মিটিয়ে দেন।

প্রবল হাস্যধ্বনি উত্থিত হয় সুরধনির বুকে।
তটভূমি লোকারণ্য হয়ে ওঠে। নরনারী গঙ্গাতীরে ছুটে আসে মহাপ্রভুর জলকেলি দেখতে।
শচীদেবী, মালিনী ও পড়শী নারীরাও আসেন এই জলকেলি দেখতে। তাদের মানস নয়নে ভেসে ওঠে কালিন্দীর কালোজলে ব্রজলীলার জলবিহার। বিস্মৃত অতীত তাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। নিজেদের ধন্য মনে করেন তারা।
সে এক অনির্বচনীয় অননুভূত অচিন্ত্যনীয় দৃশ্য।

* তৃতীয় পল্লব *

মহাপ্রভুর শ্রীবাসের প্রতি এই বিশেষ প্রীতি ও অনুগ্রহ যেমন তার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীব দল বাড়িয়ে তুলল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে তার শত্রুর সংখ্যাও গজিয়ে উঠল। এই অযাচিত সৌভাগ্যকে একদল হিংসার চোখে দেখল। নিন্দুকের মত হিংসুকেরও অভাব নেই সংসারে। তা ছাড়া মায়াবাদী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের সংখ্যা বড কম ছিল না নবদ্বীপে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের চিরকালের বিরোধ। অথচ তারা শিক্ষায় দীক্ষায় ও সামাজিকতায় কোন অংশে হেয় নয়।

শ্রীবাসের মহাপ্রভুব উপব এই প্রভাব নবদ্বীপের এক তেজোময় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। তিনি টোলের পণ্ডিত। নাম তাঁর চাপাল গোপাল। শ্রীবাসেব সৌভাগ্যকে তিনি হিংসার চোখে দেখলেন। নামে তাব বিশ্বাস নেই। সংকীর্তনে আস্থা নেই।

তাঁর অসূয়া ক্রমশঃ ক্রোধে পরিণত হল। শ্রীবাসের উপর প্রতিহিংসা নেবার একটা প্রমত্ত বাসনা তাকে পেয়ে বসল।

একদিন কীর্তনের পর বাত্রির অন্ধক রে চাপাল গোপাল শ্রীবাস অঙ্গনে মদ্যপায়ী তান্ত্রিক পূজার উপকরণ, রক্তজবা এবং একভাণ্ড মদ্য পর্যন্ত রেখে এলেন। কেউ জানতে পারল না।

শ্রীবাসকে মনোকষ্ট ও দুঃখ দেবার জন্যই তাঁর এই প্রয়াস।

প্রভাতে উঠে শ্রীবাস এই সব দ্রব্যসম্ভার ও মদ্যভাণ্ড দেখলেন। তার বুঝতে বাকি রইল না যে এ চাপাল গোপালের কাণ্ড। তিনি পাড়ার লোককে ডেকে সব দেখালেন এবং লোকদ্বারা সেই স্থান ধৌত করিয়ে গোময় লিপ্ত করালেন।

তিন দিন পরে চাপাল গোপাল কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হল।

টোলের এক ছাত্র তার স্ফীত আঙুল লক্ষ্য করে তাকে প্রশ্ন করল এবং কারণ জিজ্ঞাসা করল। দাম্ভিক ব্রাহ্মণ সদম্ভে উত্তর দিল, "যা ভাবচো তা নয়। আমি নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। প্রত্যহ শিবপূজা করি। আমার কেন ও ব্যাধি হবে?"

দিন যায়। ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি পায়।

চাপাল স্ত্রী-পুত্রকে অত্যন্ত নির্যাতন করতো ও যন্ত্রণা দিত। তারা তার বাসের জন্য বাড়ির বাইবে একখানা চালা বেঁধে দিল।

চাপালের ব্রাহ্মণী তার কাছে যেতেন না। দিনান্তে একবার নাকে আঁচল চাপা দিয়ে দূরে তার আহার্য রেখে পালিয়ে আসতেন। চাপাল আহাব শেষ করে যষ্ঠিতে ভর দিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে বসে থাকতেন। আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব কেউ তার ত্রিসীমানায় যেত না।

একদিন মহাপ্রভু গঙ্গাস্নানে এসে চাপাল তাকে অনুনয় করে বলল, "নিমাই তুমি আমাব পড়শী, তোমার সঙ্গে আমার দূর সম্পর্ক আছে। শুনি তুমি নাকি সাধু হয়েছ। ব্যাধি সারাতে পারো। আমার ব্যাধি ভালো করে দাও না?"

চাপাল তখনও মানসিক উৎকর্ষ লাভ কবেনি। তার মনের মলিনতা দূর হয়নি। তখনো তাব দম্ভ ও অহঙ্কার রয়েছে পূর্ণভাবে।

মহাপ্রভুর মাঝে শ্রীভগবান আবির্ভূত হয়ে বললেন, "তুমি ভক্তদ্রোহী। তোমাব সামান্য কুষ্ঠ হয়েছে মাত্র। তোমাকে আরো অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে।" ভগবান অন্তর্হিত হলেন।

চাপাল বারাণসী গেলেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ধর্ণা দিলেন। বিশ্বেশ্বর স্বপ্নে তাকে আদেশ দিলেন, নবদ্বীপে শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। সবিনয়ে তাঁর শ্রীচরণে গিয়ে আশ্রয় নাও। রোগ হতে নিষ্কৃতি পাবে।"

চাপাল নবদ্বীপে ফিবে এলেন।

পাঁচ বছর পরে ফুলিয়া গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পেয়ে তাঁর চরণ প্রান্তে ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁর করুণা ভিক্ষা করলেন। সকাতরে বললেন, "হে শচীর ঘরের পূর্ণব্রহ্ম, তোমায় কাশীর বিশ্বেশ্বর আমায় চিনিয়ে দিয়েছেন। তুমি আমায় কৃপা করো গৌরহরি। আমাকে রোগমুক্ত করো।"

করুণাময় শ্রীভগবানের কানে পৌঁছিল চাপালের আর্তি ও আকুলতা। কৃপাপরবশ হয়ে বললেন, তুমি শ্রীবাসের কাছে অপরাধী। তার কাছে গিয়ে তার পাদোদক পান কর। রোগ হতে উদ্ধার পাবে। চাপাল শ্রীবাসের শরণাপন্ন হলেন এবং ভবযন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভ করে নিস্তার পেলেন।

চাপাল গোপাল উদ্ধার হল এবং পরবর্তী জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্তরূপে গণ্য হলেন।

মহাপ্রভুর আদেশে কীর্তনের সময় শ্রীবাস অঙ্গনে বহিরাগতের প্রবেশাধিকার ছিল না। কীর্তনে ব্যাঘাত ঘটবে বলে। মহাপ্রভুর অনুমোদিত ভক্ত ভিন্ন আর সকলের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। আসলে অভক্তদের কাছে তিনি তাঁর আবেশ ও প্রকাশ দেখাতে চাইতেন না। প্রকাশ ও অপ্রকাশ অবস্থায় তাঁর ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন সত্তা। কখন মানুষ আর কখন শ্রীভগবান বোঝা শক্ত। একই সত্তার বহুধা প্রকাশ। কীর্তনের সময় মণ্ডপে বহিরাগতের বা অভক্তের অলক্ষ্য উপস্থিতি মহাপ্রভু অনুমান করতে পারতেন। সঙ্কীর্তনে নৃত্য করতে করতে মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, আজ আমার প্রেম শুকিয়ে গেল কেন? কীর্তনে আনন্দ পাচ্ছি না কেন? নিশ্চয় কোন বহিরঙ্গ ব্যক্তি এখানে প্রবেশ করেছে।

অনুসন্ধান করে দেখা যেত কেউ না কেউ গোপনে সেখানে অবস্থান

করছে মহাপ্রভুর কীর্তন শোনবার ও নৃত্য দেখবার জন্য।

শ্রীবাস এমন বহুবার মহাপ্রভুর বিনা অনুমতিতে মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষী সাধুসজ্জনকে সেখানে প্রবেশ করতে দিয়ে তাঁর কাছে অপরাধী এবং অপদস্থ হয়েছেন।

কীর্তনে নৃত্য করতে করতে মাঝে মাঝে তিনি মূর্চ্ছিত ও অচেতন হয়ে পড়তেন। এমত অবস্থায় প্রিয় ভক্তেরা ছাড়া আর কেউ তাঁর পরিচর্যা করে এ তিনি পছন্দ করতেন না।

এমত অবস্থায় আচার্য অদ্বৈত বা শ্রীবাসের মত ভক্তেরাই তাঁর সন্নিকটে উপস্থিত থাকবার অনুমতি পেত।

তিনি বলতেন, "অদ্বৈতর মত ভক্ত আমার ত্রিজগতে নাই।"

অদ্বৈতকে তিনি শিব বলতেন।

তাঁকে তিনি প্রচুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন।

অদ্বৈত মাঝে মাঝে মহাপ্রভুর সঙ্গে কপট কলহ করতেন। বলতেন, এ সব নাচ-গান আবার ধর্ম কি ?

—কলিতে আবার কিসেব অবতার ?

শ্রীবাস মুখ ভার করে বলেন, তোমাকে অদ্বৈত গোঁসাই কিন্তু ভগবান বলে মানতে চায় না।

মহাপ্রভু উত্তর দেন, তবু ঐ আমার সব চেয়ে বড় ভক্ত। ওর কাছে কিছুদিন প্রেমের পাঠ নিতে হবে।

প্রকৃতই আচার্য অদ্বৈত কীর্তনে নৃত্য করতেন অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির কৃপায় ও প্রভাবে।

তিনিই ছিলেন সবার বয়োজ্যেষ্ঠ। জরা ও উপবাসে শরীর শীর্ণ। রোগে শরীর আক্রান্ত। সেই শরীর নিয়ে শুভ্রকেশ স্থবির বৃদ্ধ যখন প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন, সকলে স্তম্ভিত হয়ে তার পানে চেয়ে দেখত। মহাপ্রভু তাঁর সামনে নৃত্য করতে করতে কম্পিত স্বরে অনুনয় করতেন, "প্রেম দাও। প্রেম দাও গোঁসাই! প্রেমের

অভাবে আমি বড় দুঃখ পাচ্ছি।

নৃত্যরত অদ্বৈতকে লক্ষ্য করে মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলতেন, ওঁর কাছে ভক্তি শিক্ষা করতে হয়।”

শ্রীবাসের সামনে আচার্যকে মহাপ্রভু বলতেন, গোঁসাই তোমার এই শরীর নিয়ে, এই বয়সে তুমি নাচো নিছক প্রেমের শক্তিতে। প্রেম না থাকলে তোমার মত প্রকৃত নৃত্য করা যায় না। তুমি প্রেমোন্মত্ত হয়ে প্রেমানন্দে নৃত্য কর। তোমার নৃত্য দেখে আমার হিংসা হয়। তোমার প্রেমের কণামাত্র যদি আমি ও শ্রীবাস পেতাম আমরা ধন্য হতাম! গোঁসাই! তুমি প্রেমের ভাণ্ডারী! নিতায়ের মত আমাদেরও কৃপা করে কিছু প্রেমধন দান কর। আমরা ধন্য হই।”

শ্রীবাস আচার্যকে বলেন, তা সত্যি। তোমার কাছে প্রেম না পেলে অবধূত নিত্যানন্দ অমন প্রাণ-মাতান নাচ নাচতে পারতো না। অদ্বৈত আচার্য তাঁর কথার উত্তর দেন না। নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলান।

কপট ক্রোধ কম্পিত স্বরে প্রভু বলেন, দেখ তুমি আমাদের প্রেম না দিলে, আমি তোমার সমস্ত প্রেম শুষে নেব।”

এটা অদ্বৈতেরই কথা। মহাপ্রভু তাঁকে ফেরৎ দিলেন।

অদ্বৈত মাঝে মাঝে আড়ালে আবডালে বলতেন, বিশ্বম্ভরের প্রেম আমি শুষে নেব, দেখি ও কেমন করে নাচে।”

শ্রীবাস অঙ্গনের অভ্যন্তরে কীর্তন হচ্ছে। ভক্তেরা নাচছে। নাচছে নিত্যানন্দ। নাচছে অদ্বৈত আচার্য। নাচছেন প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু।

শ্রীবাসের ডাক পড়ল, প্রভু ডাকছেন। ত্রস্তে ছুটে গেলেন শ্রীবাস

মহাপ্রভু সকাশে।

মহাপ্রভু বললেন, দেখতো শ্রীবাস, কে এখানে এসেছেন। নাচতে পারছি না। কীর্তনে আনন্দ পাচ্ছি না।

বাড়ির কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করে কীর্তন হত। অথচ প্রভু বলছেন, বাইরের লোক আছে।

তাঁর আদেশ ভক্তদের কাছে ঈশ্বরের আদেশ।

শ্রীবাসের মুখের রক্ত উবে গেল। রক্তহীন বিবর্ণমুখে শ্রীবাস রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ প্রভু আমি তোমার চরণে অপরাধ করেছি। একজন সাধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ ঠেলতে না পেরে তোমার বিনা অনুমতিতে তাকে এখানে আসতে দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করো। লোকটি সাধু ও সজ্জন। শুধু দুধ পান করে দিনাতিপাত করেন। প্রভু এতক্ষণ স্থির হয়ে শুনছিলেন। এইবার কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। স্মিত হাস্যে কুটিল কণ্ঠে প্রভু বলে উঠলেন, শুধু দুধ পান করে জীবন ধারণ করলেই ভগবানকে পাওয়া যায় না। অতএব তোমার সাধুকে এখান থেকে যেতে বল।" প্রভুর মনোভাব বুঝে ভক্তরা সেই নিরীহ ব্রাহ্মণকে বলপূর্বক অঙ্গনের বাহির করে দিল। কিন্তু ভদ্রলোক এই ভাবে অপমানিত হয়েও বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হলেন না। বরং তিনি বিনা অনুমতিতে এসে অপরাধ করেছেন বলে স্বীকার করলেন।

যাবার সময় তিনি নিম্নস্বরে বললেন, যা চাক্ষুস করলুম ইহ জীবনেও তা ভুলতে পারবো না। মরলোক মানুষের সাধ্যাতীত। এ অনুভব করবার জিনিস। এ অদ্ভুত অপূর্ব দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনুষ্যজনোচিত নয়। এ দেবলীলা। নিমাই পণ্ডিত নিঃসন্দেহ সাক্ষাৎ ভগবান। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরি। তাই সম্ভব হয়েছে এই অমিত শক্তি। মনে মনে গৌরাঙ্গ চরণে প্রণতি জানাতে জানাতে ব্রাহ্মণ অঙ্গনের দ্বার উদ্ঘাটন করে বাহিরে যাচ্ছিল, এমন সময় এক ভক্ত এসে ডাক

দিল প্রভু ডাকছেন।

ব্রাহ্মণ দ্রুতপায়ে ভিতরে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিত হল।

—ওঠ! মহাপ্রভু তার হাত ধরে তুললেন। বললেন, তোমার কোন অপরাধ নাই। তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য তোমাকে দণ্ড দিলাম। তুমি দণ্ড পেয়েও বিরক্ত বা রাগ না করে যা চিন্তা করতে করতে প্রত্যাগমন করছিলে তা আমার গোচর হয়েছে। "আমি যে বলেছি দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করলেই ভগবানকে পাওয়া যায় না, সে কথা ঠিক। তবে তুমি যে ঐ ভাবে শ্রীভগবানের চরণ লাভে কৃতসঙ্কল্প হয়েছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেব। তোমাকে আলিঙ্গন করবো।"

তিনি ব্রাহ্মণকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। ব্রাহ্মণ তার প্রেমধনে কৃতার্থ হয়ে তাঁর বুকের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

অতঃপর ব্রাহ্মণ চিরদিন শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হয়ে রইলেন।

মহাপ্রভু অনেক ভক্তকে গোপনে প্রেমদান করতেন। কৃপা করতেন। কৃপাপাত্র মনে হলে ভগবান কৃপাপ্রার্থীকে স্বতঃই কৃপা করেন।

ভক্তেরা জানতে বা বুঝতে পারে না।

নবদ্বীপের প্রান্তদেশে শুক্লাম্বর নামে এক ভক্ত ছিলেন। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী ও ভগবদ্ভক্ত। মহাপ্রভু তাঁর খুদ কেড়ে নিয়ে ভক্ষণ করতেন।

শুক্লাম্বরের মনে বড় ক্ষোভ ছিল। ভক্তের এই ক্ষোভ মেটাবার জন্য প্রভু একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে অন্ন ভোজন করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শুক্লাম্বর প্রভুর এই অযাচিত প্রতিশ্রুতিতে যুগপৎ আনন্দিত ও বিষণ্ণ হলেন। সামাজিক কারণে তার অন্ন প্রভু ভোজন করতে পারেন না। সবিনয়ে শুক্লাম্বর মিনতি-কাতর কণ্ঠে বললেন, "দীন অভাজনকে রক্ষা করুন প্রভু। সে দুঃসাহস আমার নেই। আমার প্রস্তুত অন্ন আমি আপনাকে দিতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু মহাপ্রভু শুনবেন না।

শুক্লাম্বর ফাঁপড়ে পড়লেন। কী যে করবেন বুঝে ওঠেন না। ছুটলেন ভক্তদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। ভক্তেরা উপদেশ দিলেন, অনায়াসে দিতে পারো। প্রভুর জাতবিচার নাই। শ্রীভগবান সকলেরই অন্ন গ্রহণ কবেন। তুমি স্বচ্ছন্দে প্রভুর ভোগ দাও।

শুক্লাম্বর আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরে গেল এবং পরম পবিত্রমনে ও শুচিতার সঙ্গে রন্ধন আয়োজন করলেন। অন্নের সঙ্গে একখণ্ড গর্ভ-থোড় দিলেন। মনে মনে লক্ষ্মী দেবীর ধ্যান ও স্তব করলেন।

মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান করে মহাপ্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শুক্লাম্বরের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

প্রভু নিতায়ের সঙ্গে আহারে বসলেন। পরম পরিতৃপ্ত হয়ে ভোজন করলেন। ভক্তেরা তাঁদের পরিবেষ্টন করে তাঁদের ভোজন পর্ব দর্শন করলেন।

প্রভু বলেন, এমন সুস্বাদু অন্ন জীবনে কখনো আহার করিনি। আর গর্ভথোড় যে এত উপাদেয় তা জানতুম না।

দুই প্রভুতে আহার শেষ করে উঠলেন। প্রসাদ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

সে এক অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় দৃশ্য।

শুক্লাম্বরের বাড়ী গঙ্গাতীরে।

গ্রীষ্মকাল। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে মৃদুমন্দ বাতাস আসছে। মহাপ্রভু

সেইখানেই বিশ্রাম করতে চাইলেন। শুক্লাম্বর তাঁদের বিশ্রামের আয়োজন করে দিলেন।
সকলে শয়ন কবলেন।

মহাপ্রভুর পাশে শয়ন কবলেন বিজয় নামে এক কায়স্থ ভক্ত।
বিজয় মহাপ্রভুব প্রিয়ভক্ত। তাঁর মত আখরিয়া বা লিপিকার নবদ্বীপে কেউ ছিলেন না। তিনি মহাপ্রভুকে বহু পুঁথি লিখে দিয়েছিলেন।
সকলে নিদ্রাভিভূত। হঠাৎ বিজয় হুঙ্কাব কবে উঠে পড়লেন।
ব্যাপার কি?
কখন এক সময় হয়তো নিদ্রাব ঘোরে মহাপ্রভু নিদ্রিত বিজয়ের বুকেব উপব তাঁব শ্রীকর স্থাপন করেন। তাঁর শ্রীকর স্পর্শে বিজয়েব নিদ্রাভঙ্গ হয়। বিজয় নয়ন উন্মিলন করে সবিস্ময়ে দেখে যে যে-কব তাব বক্ষে স্থাপিত সে কব চিন্ময় ও বত্নাভরণে ভূষিত।
বিজয় আনন্দে ও বিস্ময়ে আত্মহারা। তার সর্বাঙ্গে পুলকের বোমাঞ্চ। নিখিল বিশ্ব তার আনন্দময়, আনন্দময়ের স্পর্শ পেয়ে তাব মানব জন্ম সার্থক হয়েছে। জগৎ সংসাব আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে। তার কুটির হয়ে উঠেছে পুণ্যতীর্থ।
সকলেব নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে বিজয়েব হুঙ্কার ও আনন্দধ্বনিতে। প্রভুর সঙ্গে সকলে বিজয়কে প্রশ্নেব তীব মেবে জর্জরিত করে দিল।
নিরুপায় বিজয় সবিস্তারে বর্ণনা করলে তার নিদ্রাভঙ্গের ও হর্ষের কাহিনী।
বিজয় তখনও কাঁপছে। তখনো তার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত প্রায়।
প্রভু মাথা দুলিয়ে মধুব হাসি হেসে বললেন, বিজয়ের ওপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আছে। তাঁকেই বিজয় হয়তো দেখে থাকবে।

কিংবা এ গঙ্গার মাহাত্ম্যও হতে পারে। তবে কিছু একটা ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহ বিজয় দেখেছে।

প্রভু নিজেই যে তাঁর প্রকাশ দেখিয়েছেন সেটা গোপন রাখলেন। তিনি না বললেও নিষ্ঠাবান ভক্তদের সে কথা বুঝতে বাকি রইল না। বিজয়ের আহার গেল নিদ্রা গেল, ঘুমন্ত মানুষের মত সে শুধু শূন্য পানে চেয়ে থাকে।

* চতুর্থ পল্লব *

—এসো একদিন রূপসজ্জা ও অঙ্গসজ্জা করে আমরা কৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করি।

ভক্ত পার্ষদ পরিবেষ্টিত গৌরাঙ্গদেব শ্রীবাসের কাছে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা শুনতে শুনতে বললেন।

ভক্তেরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসুনয়নে তাঁর মুখপানে তাকালেন। প্রশ্ন করলেন, কীরকম? যাত্রাভিনয়?

প্রভু উত্তর দিলেন, অনেকটা সেই ধরনের। এক একটি ভূমিকায় মূর্ত হয়ে ভাবের অভিব্যক্তি করার নামই অভিনয়। যখন সত্যের রূপ নেয় তখন সে আর অভিনয় নয়। সে সত্য হয়ে ওঠে। অদ্বৈতর নৃত্য তার প্রেমোন্মত্ত ভাবাবেশ অভিনয় নয় সে পরম সত্য। সে প্রকৃত। তোমরা আগে কৃষ্ণলীলার সাজসজ্জা প্রস্তুত কর। তারপর কী করতে হবে বলব। কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ ও সদাশিব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অঙ্গসজ্জা প্রস্তুত করবার ভার নিলেন।

অতঃপর স্থান নির্বাচন হলো শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মেসোমহাশয় আচার্য চন্দ্রশেখরের আবাস।

স্বয়ং প্রভুর নির্দেশেই ও ইচ্ছায় চন্দ্রশেখরের বাড়ী ঠিক হল। শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আসতে পারবেন না ভেবেই চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ী ঠিক করলেন।

স্থান কাল নির্বাচিত হলে ভূমিকা ও সংলাপের বিষয় আলোচনা হল।

প্রভু বলেন, আমি সেখানে রমণীর বেশে নৃত্য করবো।

অদ্বৈত আচার্য তাঁর সামনে উপবিষ্ট। তাকে লক্ষ্য করে তিনি

শিবাবতার এইরূপ ইঙ্গিত করে নিম্নস্বরে বলেন, আমি এমন রূপসী মোহিনী মূর্তি ধারণ করবো যে সেখানে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেউ থাকতে পারবে না।

অদ্বৈত বিষণ্ণ হলেন। ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, তাহলে আমার সেখানে যাওয়া হবে না। কারণ জিতেন্দ্রিয় গৌরব আমার নাই।"

শ্রীবাসও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, আমারো অবস্থা তাই। আমারো যাওয়া হবে না।

মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রভু বলেন, তোমরা কেউ না গেলে আমি আনন্দ করবো কাকে নিয়ে?

একটু থেমে ঈষৎ হাস্য করতে করতে প্রভু বলেন, বেশ। আমার বরে তোমরা সকলে জিতেন্দ্রিয় হবে। আমার রূপ দেখে কেউ মোহগ্রস্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত হবে না।"

প্রবল হাস্যরোল উত্থিত হল। ভক্তেরা হরিধ্বনি করে ওঠে।

ভূমিকা নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রভু বলেন, আমি হব রাধা। গদাধর হবে ললিতা। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হবে বড়াই। হরিদাস কোতোয়াল ও শ্রীবাস নারদ।

অদ্বৈত কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রশ্ন করেন, আমার প্রতি প্রভুর আদেশ?

প্রভু অকুণ্ঠ দৃঢ়স্বরে উত্তর দেন, তুমিই তো সব। তুমি হবে শ্রীকৃষ্ণ।

অতঃপর সংলাপ বা কে কি বলবে এবং কে কখন কী ভাবে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করবে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলেন, সংলাপ হবে স্বতঃস্ফূর্ত। সময়ে আপনা থেকেই ভাব ও ভাষার উন্মেষ হবে। আবৃত্তি করতে হবে না।

সকলে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। প্রভুর মনের গভীরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য।

তোড়জোড় চলেছে। পূর্ণোদ্যমে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাজ-সজ্জা সংগ্রহ করা হচ্ছে। চুল, গোঁফ-দাড়ি, তৈরি হচ্ছে।
নির্দিষ্ট দিনে বুদ্ধিমন্ত খাঁন আচার্য চন্দ্রশেখরের বাড়ীর আঙিনায় চাঁদোয়া খাটিয়ে দিলেন। দর্শকদের বসবার আসন পাতালেন। মহিলাদের পর্দার ব্যবস্থা করালেন। দীপসজ্জা করলেন।
সজ্জাকক্ষ প্রস্তুত হল। সাজাবার ভার নিলেন বাসুদেব আচার্য। পাঁচজন গায়ক ঠিক হল। ১। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ২। আচার্য চন্দ্রশেখর এবং শ্রীবাসের তিন ভাই।
সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা একে একে উপস্থিত হচ্ছে। যারা ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন, তারা সাজ-ঘরে গিয়ে সজ্জা করছে।
শচীদেবী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। এসেছেন মালিনী তাঁর ভগ্নিদিকে সঙ্গে নিয়ে। মুরারীর স্ত্রী এসেছেন। অন্যান্য ভক্তদের বাড়ীর নারীরাও এসেছেন। বাড়ীর অন্তঃপুর স্ত্রীলোকে ভরে গেছে।
দোর বন্ধ করা হল। প্রভু আদেশ দিলেন, আর কেউ যেন না আসে। চিকের পেছনে স্ত্রীলোকেরা আসন গ্রহণ করলেন।

প্রথমে বাদ্যারম্ভ হল। তারপর সুকণ্ঠ গায়কদল মধুর সুরে শ্রীকৃষ্ণরাধার স্তবগান গাইল।
সকলে আনন্দে হরি-ধ্বনি করল। অভিনয় আরম্ভ হল।
সূত্রধরের রূপসজ্জা দিয়ে হরিদাস রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। হরিদাসের মুখে মস্ত বড় গোঁফ, কাঁধে লাঠি, হাতে কুন্দ ও মল্লিকা পুষ্পের মালা। তিনি প্রবেশ করেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ও স্তব করে রঙ্গভূমির অর্চনা করলেন। বিগলিত নয়নজলে তাঁর গণ্ডদ্বয় প্লাবিত। অর্চনা শেষে বললেন, হে রঙ্গভূমি, শ্রীবৃন্দাবন তোমার মাঝে

অধিষ্ঠিত হোক। তারপর বললেন, আজ আমি ব্রহ্মার কাছে গিয়াছিলাম। সেখানে নারদ মুনি উপস্থিত ছিলেন। নারদ মুনি বললেন, তাঁর কৃষ্ণ-লীলা দর্শন করবার সাধ বহুদিনের। তিনি নাট্যাকারে সেই লীলা দেখাবার আদেশ দিলেন।

কি করে তার বাসনা পূর্ণ করাব তাই ভাবছি। ভগবানের অলৌকিক লীলা অপেক্ষা লৌকিক লীলা অনেক মধুর। তাঁর মধুর লীলা আস্বাদ করলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়। শ্রীভগবানও ভক্তের ভজনকে সহজ করবার জন্য নরলীলা করেন। তাঁকে কোন কৃষ্ণলীলা দেখাতে না পারলে তিনি অভিশাপ দেবেন।

অদূরে বীণাধ্বনি শোনা গেল। অল্পক্ষণ পরে বীণাযন্ত্র হাতে কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে গাইতে নারদের বেশে শ্রীবাস রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে তাঁর স্নাতক। ইনি শুক্লাম্বর। নারদের বেশভূষা অপরূপ। তাকে শ্রীবাস বলে কেউ চিনতে পারল না। আসল শ্রীবাস নারদের মাঝে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তিনি আসল নারদ বনে গেছেন। প্রতি পদক্ষেপে তিনি মূর্তিমান্ নারদ। এমন কি তাঁর ব্রাহ্মণী মালিনী পর্যন্ত তাঁকে চিনতে পারে না।

সবচেয়ে বিস্ময়ের বস্তু হল যখন শ্রীকৃষ্ণের বেশে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলেন।

সে এক অনির্বচনীয় বিস্ময়কর দৃশ্য।

সকলে বিস্ফারিত বিস্ময় বিমূঢ় নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রৌঢ় অদ্বৈতর সে কিশোর রূপ সকলকে স্তম্ভিত করে দিল।

সে এক অদ্ভুত অলৌকিক প্রকাশ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দেহে আবির্ভূত।

সে জ্যোতির্ময় অনৈসর্গিক রূপের তুলনা হয় না। সে রূপসজ্জা নয়। স্বয়ং রূপময়ের স্বরূপ প্রকাশ অতনুর তনু গ্রহণ।

সূত্রধরের সঙ্গে গোপীবেশে গদাধর প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সখি সুপ্রভা।

নারদ প্রশ্ন করলেন, তোমরা কে ?

সুপ্রভা উত্তর দিলেন, আমরা গোয়ালার মেয়ে। ব্রজে থাকি। গোপেশ্বরের পুজো দিতে যাচ্ছি। আপনি কে ?

নারদ। আমি কৃষ্ণের দাস। নারদ।

(সকলে নারদকে প্রণাম করল।) গোপীবেশী গদাধর সকাতরে নারদকে বললেন, ঠাকুর আমি কেমন করে শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গৌরচন্দ্র রূপে নবদ্বীপে উদয় হয়েছেন, তাঁর চরণ পাবো ? (গদাধরের কণ্ঠ ও নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত। নারদের চরণে পড়ে তিনি কাঁদলেন।)

নারদ (সান্ত্বনার কণ্ঠে) অবশ্য তুমি সে চরণ পাবে। প্রত্যহ গঙ্গার জলে গাত্রমার্জনা কোর।

একটু পরে নারদ গোপীকে বলেন, তুমি বৃন্দাবনের গোপী। নিশ্চয়ই নাচতে পারো। আমাকে নাচ দেখাও।

রূপময়ী গোপীরূপী গদাধর তখন প্রেমে বিহ্বল। প্রেমাশ্রুতে রক্তিম গণ্ড প্লাবিত। তিনি সখির অঙ্গে ভর দিয়ে মৃদঙ্গ করতাল সুরযন্ত্র সহকারে নৃত্যারম্ভ করলেন। প্রেমাবেশে মধুর নৃত্য করলেন।

হরিদাস সূত্রধর কাঁধে লাঠি রেখে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলেন, "দিন গেল, কৃষ্ণ ভজ। এমন ঠাকুর আর পাবে না।"

সুপ্রভা গদাধর (গোপী) কে বলেন, সখি, সময় হয়ে গেল, পুজোয় যাবে না ?

গদাধর (নারদকে) ঠাকুর অনুমতি দাও। আমরা যাই। (গদাধর সকলের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।)

স্নাতক। এঁরা বৃন্দাবনে গেলেন। চল আমরাও যাই।

নারদ। কেন, একি বৃন্দাবন নয় ?

স্নাতক। ঠাকুর পাগল হয়েছ। এ বৃন্দাবন কোথায় ?

নারদ। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে লোকে পাগলই হয়। চল, বৃন্দাবনে যাই।

উভয়ে প্রস্থান করলেন।

নারদ যেতে যেতে বলেন, বৃন্দাবনের নামে আমার অন্তরে আনন্দ উথলে উঠছে। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্থান। সেখানের সব কিছুই আনন্দময়। আমার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে বৃন্দাবন একটু স্থান ভিক্ষা করে বলেছিলেন, "আমাকে বৃন্দাবনের ক্ষুদ্র তৃণ কর।" শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন? ক্ষুদ্র তৃণ হতে চাও কেন?

ব্রহ্মা বলেছিলেন, যাকে সহস্র বছর ধ্যান করেও মুনি ঋষি ও যোগীরা দর্শন পায়নি, সেই তোমাকে গোপীরা প্রেমবলে সর্বদা দর্শন করছেন। আমি যদি তৃণ হই, সেই গোপীদের পদরজ সর্বদা পাব।"

দূরে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শোনা গেল। সেই মুরলীধ্বনিতে সারা নবদ্বীপ চকিত হয়ে উঠল। সে এক অশ্রুতপূর্ব অলৌকিক ধ্বনি। সকলের অঙ্গ রোমাঞ্চিত ও শিথিল হয়ে এল।

নারদ। শোন। ঐ শোন। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি। বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ আসছেন। আমি শ্রীঅঙ্গের গন্ধ পাচ্ছি। চলো, একটু দূরে যাই, নইলে আমি জ্ঞান হারাব। কিছু দেখতে পাব না।

(অন্তরালে গমন ও অবস্থান)

(সখাগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণরূপী অদ্বৈতের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুরলী। অদ্বৈত মহাপ্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত। বার্ধক্যের উপান্তে উপস্থিত। তবুও তাকে দেখাচ্ছে যেন পনের বছরের কিশোর। তার ভুবনমোহন রূপমাধুরী সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ ও অবশ করে দিয়েছে।

মেয়েরা হুলুধ্বনি দিল এবং দর্শকেরা হরিধ্বনি দিল।

শ্রীকৃষ্ণরূপী অদ্বৈত বললেন, সখা শ্রীদাম! দেখ দেখি বৃন্দাবনের

কি অপরূপ শোভা হয়েছে। ফুলের শোভায় ও সৌরভে দশদিক আলোকিত ও আমোদিত। ত্রিজগতের মধ্যে এইটি আমার প্রিয় স্থান।

শ্রীদাম বলেন, বৃন্দাবনের শোভার চেয়ে তোমার বৃন্দাবনের খেলা অনেক ভাল।

শ্রীকৃষ্ণ সখাদের নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করেন, এখানে মধুমঙ্গলকে দেখছি না কেন? তাকে খুঁজে নিয়ে এসো।

মধুমঙ্গল ব্রাহ্মণপুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা।

(ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে মধুমঙ্গলের প্রবেশ।)

মধুমঙ্গল। (হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রীকৃষ্ণকে) আজ পথে ব্রহ্মহত্যা হতো। তোমার কৃপাবলে বেঁচে এসেছি। বৃন্দাবনে কতকগুলি গোপ বালিকার সঙ্গে এক বৃদ্ধাকে দেখলাম। মনে হয় বুড়ি ডাকিনী। আমাকে বনের মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পেলেই ধরে নিয়ে গিয়ে গোপেশ্বর শিবের কাছে বলি দিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! ব্যাপার কি? মধুমঙ্গল এ কাদের দেখে এল?

সুবল। বোধ হয় শ্রীমতী রাধা সখিদের ও বড়াই বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে শিবপূজা করতে এসেছেন, গোপেশ্বর মন্দিরে।

মধুমঙ্গল (সশব্দে হাসতে হাসতে) যদি শ্রীমতী এসে থাকেন সখার হাতে ধরা পড়বেন।

নারদ। (স্নাতককে) চল, আমরা অন্তরীক্ষ থেকে কৃষ্ণলীলা দর্শন করি।

নারদ ও স্নাতক প্রস্থান করিলেন।

অগ্রে মশাল ধরে পেছনে বড়াই ও সখিগণ পরিবেষ্টিত রাধা প্রবেশ করলেন।

স্বয়ং মহাপ্রভু হয়েছেন শ্রীরাধিকা, গদাধর ললিতা। এবং শ্রীনিত্যানন্দ বড়াই। আরও দুচারজন গোপ বালিকা হয়েছেন। প্রভু প্রকৃতই

ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করেছেন।

"সে রূপের তুলনা দিতে নারি।"

সে রূপের তুলনা হয় না। বর্ণনা করা যায় না। তার মাঝে শত কোটি চন্দ্রের দিব্য জ্যোতি। তাঁর নারীরূপ মহাপ্রভুকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাঁকে পুরুষ বলে বোঝা যায় না। শচীমাতা তাঁকে চিনতে পারেন না। চিনতে পারেন না শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। সেই রূপ দেখে, কি পুরুষ, কি নারী সকলেই বিমোহিত হল। মহাপ্রভু যে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি এমন রূপ ধারণ করবো যা দেখে সকলে পাগল হবে। সত্যই তাই হল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে বিস্ময় বিমূঢ় নয়নে তাঁর রূপমাধুরী লেহন করল। কখন একসময় নিজেদের অজ্ঞাতে শঙ্খধ্বনি করল। নারী কণ্ঠে উলুধ্বনি দিল। পুরুষেরা হরিধ্বনি দিল।

মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, চলো, আমরা কুঞ্জের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি গোপ বালিকারা কি করেন।

সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরালে গমন।

শ্রীরাধিকা (প্রভু) এইবার কথা বলেন। ললিতারূপী গদাধরকে বলেন, দেখ ললিতে! গোপেশ্বরের পূজার জন্যে সব আয়োজন করে এনেছি। আনা হয়নি শুধু ফুল। শুকিয়ে যাবে বলে।

ললিতা। তার ভাবনা নেই। বৃন্দাবনে ফুলের অভাব কি?

শ্রীরাধিকা। অভাব নেই সত্য কিন্তু এখানে বন্য হস্তী আছে। ভয় করে।

মধুমঙ্গল। (শ্রীকৃষ্ণকে) শুনলে তো সখা, গোয়ালিনীদের আস্পর্ধার কথা?

—কি?

মধুমঙ্গল। তোমার মত নির্বোধ ত্রিজগতে নাই। নইলে ত্রিলোকের অধিপতি তুমি গরু চরাতে আসবে কেন? ঐ গোয়ালিনী তোমাকে

বন্য হস্তী বলল, বুঝতে পারলে না?

শ্রীরাধা। শুধু বন্য হাতী নয়। সঙ্গে কতকগুলি সহচর গর্দভ আছে। তারাও বড় বিরক্ত করে।

মধুমঙ্গল। শুনলে তো সখা? এসব কথা তো ভালো নয়। তুমি বনহাতী হও, তাতে আপত্তি নেই। আমি বামুনের ছেলে, আমাকে গাধা বলবে কেন?

শ্রীরাধা। চলো যাই, লবঙ্গলতিকা ফুল তুলি।

(বড়াই তাঁকে বাধা দিলেন।) নাতনি, ও কাজ করিসনি। এখন শ্রীকৃষ্ণের হাতে ধরা পড়বি। সে লবঙ্গলতিকা বড় ভালোবাসে।

ললিতা। যদি ধরাই পড়েন, তবে তোমাকে জামিন রেখে আমরা শ্রীমতীকে খালাস করে নিয়ে যাব।

মধুমঙ্গল (শ্রীকৃষ্ণকে) ওরা ফুল তুলছে এইসময় তুমি ওদের সঙ্গে একটু মজা কর। রাগান্বিত হয়ে 'কে ফুল তোলে' বলে ওদের একটু তাড়া দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে আমাদের শ্রীমতীর রূপমাধুরী ও ভাবাবেশ দর্শন থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আমবা প্রকাশ হলে ওঁরা পলায়ন করবেন। তবে তুমি যখন বলছো, তোমার সাধ অপূর্ণ রাখবো না। আমি যাচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণ অন্তরাল থেকে বাইরে এসে ললিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কারা গো? তোমাদের সাহস তো কম নয়। অন্যের বাগানে অনধিকার প্রবেশ করে ফুল তুলছো? গাছগুলো পর্যন্ত ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছো? আচ্ছা এর ফল পাবে।

বড়াই। এ বৃন্দাবন আমাদের সকলেরি। হ্যাঁরে কৃষ্ণ, তুই আবার এর কর্তা হলি কবে?

মধুমঙ্গল। তোর বাহাত্তুরে ধরেছে বুড়ি। আমরা কোথায় মেয়ে-গুলোকে বারণ করতে এলাম আর তুই ওদের প্রশ্রয় দিচ্ছিস?

বড়াই। তুই বামুনের ছেলে হলে হবে কি, তোর বুদ্ধি পশুর মতন।

ললিতা। (সক্রোধে) ওরে গর্দভ, তুই যে কথা বলতে আসিস, তুই এ বনের কে ?

মধুমঙ্গল। (সহাস্যে) আমি কে ? কৃষ্ণের এই বন। আর আমি শ্রীকৃষ্ণের সখা ও পুরোহিত।

বড়াই। ওরে না। এ বন গোপীদের পরে শ্রীকৃষ্ণকে ওরা নিজের অধিকারে নিজেদেব স্বত্ব সীমায় ফুল তুলছে। তুই বরং রাধার কাছে কিছু ফুল ভিক্ষা কর। ওর কৃপা হলে কিছু ফুল তোকে দিতে পারে।

বড়াই শ্রীরাধার আঁচল থেকে সব ফুলগুলি নিয়ে কৃষ্ণের অঙ্গে ছুঁড়ে দিলেন।

সকলে প্রস্থানোদ্যত। মধুমঙ্গল তাদের বাধা দিল। যাবে কোথা ? আগে দান দাও, পরে যাবে।

ললিতা। এ দান আবার কার ?

মধুমঙ্গল। আমার সখা শ্রীকৃষ্ণের তিনি এ বনের রাজা। কৃষ্ণের দান না দিলে কেউ বৃন্দাবনে আসতে পারে না।

বড়াই। (ব্যঙ্গ স্বরে) আরে কৃষ্ণ আবার রাজা হয়েছেন নাকি ? ভালো, কিন্তু দান নেবে কিসের ? পণ্যদ্রব্য তো কিছু নেই। সব পূজার সামগ্রী।

সুবল। (শ্রীকৃষ্ণকে) এর উত্তর তুমি দাও সখা !

শ্রীকৃষ্ণ। আমার এ দান-ঘাটের এই নিয়ম যে কুলবধূরা এখানে এলে তাদের রত্নাভরণ, অঙ্গ সঞ্চালন, বিলোল কটাক্ষ ও মধুর হাসি তাদের দান দিতে হয়।

বড়াই। আমাদের রত্নাভরণ নাই। আছে শুধু পূজাসম্ভার।

মধুমঙ্গল। গোয়ালিনীর বুদ্ধি আর কত হবে ! গোপেশ্বর আমাদের সখা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাকে রেখে আবার কার পূজা করতে যাচ্ছিস ?

শ্রীরাধা। এত কথায় দরকার কি? পূজার উপচার ওকে দেখাও।
বড়াই। তোর সখাকে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিস দান নিয়ে আসবে।
মধুমঙ্গল বড়াই-এর পূজার উপকরণ হাতে নিল।
শ্রীরাধা। এই দেখ আমার পূজার দ্রব্য অপবিত্র করে দিল। চল, আমরা বাড়ী যাই। পূজার দ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করলেন।
শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রসারিত হস্তে গমনোদ্যতা শ্রীরাধার পথরোধ করলেন।
শ্রীরাধা। পুজোর জিনিস তো সব ফেলে দিলাম। আবার কিসের দান?
শ্রীকৃষ্ণ। তা ছাড়াও তোমার মাঝে দান দেবার প্রচুর অমূল্য রত্নসম্ভার আছে।
শ্রীকৃষ্ণ দুই বাহু প্রসারিত করে তাকে ধরতে গেলেন। বড়াই মাঝ পথে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাধা দিলেন। বললেন, বড়াই। আরে নন্দের বেটা তোর সাহস তো কম নয়। তুই কুলবধূর ওপর অত্যাচার করতে হাত বাড়াস?
ললিতা। তুমি কে বউ গো? তোমার সাহস তো কম নয়। ভয় ডর নেই?
শ্রীকৃষ্ণ বড়াইকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শ্রীরাধার বসনাঞ্চলে টান দিলেন।
সঙ্গে সঙ্গে "কোপাবিষ্ট হয়ে বুড়ী কৃষ্ণকে ছাড়ায়ে অন্তর্ধান করিলেন রাধা সঙ্গে নিয়ে।" যোগমায়া অন্তর্হিত হলেন।
নিত্যানন্দ (বড়াই) নিতাই হলেন। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈত হলেন। রাধা মহাপ্রভু হলেন। ললিতা গদাধর হলেন। যোগমায়ার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সকলে পূর্বরূপ ধারণ করল।

আসলে এ তো অভিনয় নয়। এ প্রকৃত। এ শ্রীভগবানের প্রকট লীলা। স্বয়ং মহাপ্রভু অদ্বৈতের দেহে প্রকাশ হয়ে কৃষ্ণরূপ ধারণ করলেন এবং কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করালেন।

মহাপ্রভুর অসীম শক্তিমত্তা প্রকট হল আচার্য-রত্ন চন্দ্রশেখরের ভবনে। অভিনয় শেষ হল কিন্তু তারপরও সাতদিন আচার্য মন্দিরে এক পরম তেজোময় আলোকচ্ছটা বিচরণ করল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইরূপ বর্ণনা করেছেন :

"সপ্তদিন শ্রী আচার্য মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে।
সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি সবে মহা কুতূহলে॥
যতেক আইসে লোক আচার্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবার শক্তি কেহ নাহি ধরে॥
লোকে বলে কি কারণে? আচার্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফাটিয়া যেন পড়ে॥"

মুরারি গুপ্ত তাঁর কড়চায় বলেছেন :

"শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্যো রত্ন ব্যাট্যাং মহাপ্রভুঃ।
ননর্ত যত্র তত্রাসী তেজস্তু মহদ্ভুতং।
সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজসাসদৃশং হরিং॥
যে যে তত্রাগতা লোকা উচুস্তত্র কথং দৃশাঃ।
উন্মীলেন ন শক্তাং স্ববিদ্যুৎ প্রেক্ষাতু ভূতলে॥"

দীর্ঘ সপ্তাহ ব্যাপী সেই আলোকপ্রভা লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। সে এক পরমাশ্চর্য অলৌকিক প্রভা। এক সঙ্গে যেন সহস্র চাঁদের উদয় হয়েছে। অদ্ভুত তার স্নিগ্ধতা ও শীতলতা। নবদ্বীপের জনগন স্তম্ভিত হয়ে গেল। বৈষ্ণব ভক্তদের সকলে প্রশ্ন করেন। কেউ

কিছু বলতে পারেন না। বেদ-অগোচর চরিত্র যার তাঁর লীলার ও মহিমার কথা কে কী বলবে। কে কি জানবে।

মহাপ্রভুর প্রকাশ অবস্থায় তাঁর শ্রীঅঙ্গ হতে এমনি একটা তেজ নির্গত হত এবং সে তেজ কিছুকাল সেখানে স্থায়ী হত। তারপর ধীরে ধীরে তিলে তিলে সেটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিলীন হত।

চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ী থেকে সে আলোকপ্রভা ও তেজ মুছে যেতে সাতদিন লাগল।

* পঞ্চম পল্লব *

এইবার আমরা মুরারি সম্বন্ধে কিছু বলব। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাব।

মুরারি গুপ্তের অমূল্য ও প্রাণবন্ত কড়চা এই দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর কাল মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলাকে বিশেষ ভাবে লোকচক্ষে তুলে ধরে আছে। ভক্তদের অমৃত রসাস্বাদন করিয়েছে। তাঁকে আমরা প্রণাম করি। বাঙলা ও বাঙালী তাঁর ঋণ কখনো পরিশোধ করতে পারবে না। মুরারিকে নবদ্বীপ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী বলা চলে। তাঁর বিবরণ মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী।

মুরারি ছিলেন মহাপ্রভুর আবাল্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সতীর্থ। জন্মাবধি তাঁরা পরিচিত এবং একই দেশে তাঁদের বসবাস।

মুরারি সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান। তার সুঠাম দেহের অপূর্ব স্বাস্থ্য তাঁকে রূপবান করে তুলেছিল।

মুরারি বাল্যাবস্থায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরে কালে পরম পণ্ডিত ও বিশেষ বিজ্ঞ হন।

তাঁর স্বভাবটি ছিল অমায়িক ও মধুর। নিরীহ ও সরল প্রকৃতির মুরারি মহাপ্রভুকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করে। তাঁর অমায়িক স্বভাব তাঁকে সর্বজনপ্রিয় করে তোলে। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। তাঁর অমিত শক্তি ও আনন্দময় প্রকৃতি তাঁকে নবদ্বীপে জনপ্রিয় করে। এবং মহাপ্রভুর প্রিয় সখারূপে পরিগণিত হন। প্রথম জীবনে তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। তাঁর দেহে হনুমানের প্রকাশ হত। সময়ে সময়ে গড়ুরও প্রকাশ পেতেন। তখন তিনি দেহে অসুরের শক্তি লাভ করতেন।

প্রভু তাঁকে স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁর কাছেই শ্রীগৌরাঙ্গের

প্রথম প্রকাশ প্রকট হয়।

সেদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনেব খট্টাঙ্গে উপবিষ্ট হয়ে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, গরুড়! গরুড়!
মুরারি তখন সেখানে অনুপস্থিত। তিনি তাঁর বাড়ীতে। অল্পক্ষণ পরেই মুরারির কণ্ঠ শোনা গেল, প্রভু কেন আমাকে স্মরণ করেছেন? এই যে আমি গরুড।
সকলে সবিস্ময়ে দেখল মুরারি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশ কবলেন এবং গরুড়ের ভঙ্গিতে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এই যে প্রভুর বাহন গরুড়। আদেশ করুন কোথা যেতে হবে?
সঙ্গে সঙ্গে মুরারি মহাপ্রভুর দীঘল দেহকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে দৌড়তে লাগলেন।
সকলে হরিধ্বনি করে উঠল, ভিতরে মেয়েরা হুলুধ্বনি দিল।
তখন মহাপ্রভু শ্রীভগবান। মুরারি গরুড়।
মুরারি নিজের বাড়ীতে বসেই প্রভুর ডাক শুনেছিল এবং গরুড় আবেশ হয়েছিল।
পথে তিনি ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এসেছেন।
পথযাত্রীরা তাঁকে ক্ষিপ্ত ভেবেছে।
অল্পক্ষণ পরে তাঁদের দুজনেরি আবেশ কেটে গেল। আবার তাঁরা সহজ ও সরল হয়ে উঠলেন।
মুরারি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ও ভক্ত। তাঁর শ্রীভগবানে ভক্তি দাস্য। তিনি ব্রজলীলার মধুর রসের আস্বাদ পান নি।

একদিন মহাপ্রভু মুরারিকে বলেন, দেখ মুরারি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র অভিন্ন। তবুও কৃষ্ণলীলা বড় মধুর। বড় হৃদয়স্পর্শী। তুমি কৃষ্ণ ভজন করো। ব্রজলীলার মধুর রস আস্বাদন করো। এই মধুর-ভাবই ভগবৎসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ।

মুরারি কুণ্ঠিত ও কাতর অপরাধীর কণ্ঠে বললেন, প্রভু তোমার আজ্ঞা পালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে আমি বিক্রীত। কাজেই শ্রীরামচন্দ্রকে ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার আদেশ পালন করতে পারলাম না বলে আমাকে তুমি দণ্ড দাও। আমার প্রাণবধ করো।

প্রভু মুরারিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, সাধু মুরারি! রামচন্দ্রকে তুমি ছাড়বে কেন? তুমি হনুমান। তুমি ছাড়লে শ্রীরামের রইল কি? তোমার শ্রীরামে অচল ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে বর দিচ্ছি তোমার মাঝে ব্রজলীলা রস স্ফুরিত হোক। রামচন্দ্রকে ভজন কর সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলা রস অস্বাদন কর।

একদিন মুরারি-রচিত রামচন্দ্রের ভজন শুনে প্রভু এত খুশি হলেন, যে তিনি শ্রীহস্তে তাঁর কপালে "রামদাস" কথাটি লিখে দিলেন।

শ্রীরাধিকার মত মুরারির অবস্থা। সদা ভয়, 'হারাই হারাই।' ভগবান যখন অপ্রকট হবেন তখন কি হবে? ভগবান যখন থাকবেন না তখন তার দশা কি হবে? ভগবান থাকবেন না, আর সে থাকবে—এ দুঃস্বপ্ন যে তিনি কল্পনা করতেও পারেন না। অথচ এমনি একটা দুশ্চিন্তার ঢেউ উঠে তাকে মাঝে মাঝে আলোড়িত করে তোলে। প্রভুর কল্পিত বিরহ যন্ত্রণা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। মুরারি পিরীতির আস্বাদ পেয়েছেন। ব্রজলীলা মাধুরী আস্বাদ করেছেন। তাই তিনি বিরহ ভয়ে আকুল।

তিনি পিরীতির আস্বাদ পেয়ে নিজেই লিপিবদ্ধ করলেন নিজের মনোভাব: "পিরীতি এমত হয়। তার গুণ তিন লোকে গায়॥"

মুরারি পিরীতি তরঙ্গে দোল খাচ্ছেন। উচ্ছ্বসিত জলরাশি ঢেউ তুলে তাঁকে গ্রাস করতে আসছে। সে তরঙ্গ বিরহের কল্পিত জ্বালা। বিরহই তো পিরীতির পরম প্রকাশ। তার যত কিছু মাধুর্য সব ঐ বিরহের যন্ত্রণায়। তার আর্তি ও আকুলতায়।

মুরারি পিরীতি মদ আকণ্ঠ পান করে মাতাল হয়ে উঠেছেন। নেশার ঘোরে মানুষ যেমন চলাফেরা করে, ঠিক তেমনি তাঁর অবস্থা। তিনি যে কী করেন, কী বলেন নিজেই বোঝে না।

সেদিন তিনি ভালে মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত জয়তিলক ও অঙ্গে আশ্লেষের পুলকস্পর্শ নিয়ে হাসতে হাসতে স্খলিত পায়ে কোন রকমে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বলেন, ভাত দাও।

বলেন আর আপন মনে অকারণে হাসেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করেছেন :

"এক বলে আর করে, খলখলি হাসে ॥"

স্ত্রী ভাত দেন। অন্নে ঘি মেখে মুরারি ভাতের গ্রাস তুলে "খাও-খাও" তাঁর সামনের অদৃশ্য কাকে খেতে বলেন। অন্নের গ্রাস মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। সাধ্বী স্ত্রীর বুঝতে বাকি থাকে না পতির মনে কিসের তরঙ্গ বা কার মুখে অন্নের গ্রাস তুলে দিচ্ছেন।

ভাতগুলো মাটিতে পড়ে নষ্ট হলো। তাঁর স্ত্রী আবার নতুন অন্ন পাতে দিয়ে পতিকে ভোজন করালেন।

পরদিন মহাপ্রভু মুরারির বাড়ীতে গিয়ে বলেন, আমার অজীর্ণ হয়েছে একটু ওষুধ দাও।

—অজীর্ণ হলো কেন ? মুরারি জিজ্ঞেস করল।

—তুমি জানো না অজীর্ণ হলো কেন ?

—কাল অতরাত্রে ঘি-মাখা ভাতগুলো খাওয়ালে আবার জিজ্ঞেস

করছ অজীর্ণ হলো কেন? তুমি মুখে তুলে দিলে আমি ফেলি কেমন করে? মুরারি শূন্যদৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে রইলেন।

প্রভু বললেন, তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো কাল রাত্রে কী করেছো? তোমার অন্ন খেয়ে আমার অজীর্ণ হয়েছে।

মহাপ্রভু মুরারির জলপাত্র থেকে পূর্ণ একগ্লাস জল পান করে বললেন, এই তার ওষুধ।

মুরারির কল্পিত বিরহ ব্যথা মাঝে মাঝে তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। সে মনে মনে সঙ্কল্প করে প্রভুর আগে তাকে এ মবজগত থেকে যেতে হবে। প্রভু গেলেই তাঁকে দেখতে পাবেন। আবার দুজনে মিলিত হবেন।

বিরহাবসানে মিলনের এই দুর্দাম বাসনা তাঁর মধুর মনে হয়। শ্রীমতি একশো বছর চোখের জল ফেলেছিলেন। তারও সেই দীর্ঘ বিরহের পশ্চাতে ছিল মিলনের প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশাই তাঁর বিরহকে মধুর ও রমণীয় করে তুলেছিল।

বিভ্রান্ত মুরারিও চিরস্থায়ী মিলনের স্বপ্ন দেখেন প্রভুর সঙ্গে। তিনি আগে গিয়ে প্রভুর অপেক্ষা করবেন। এবং প্রভু গেলেই তাঁর দর্শন পাবেন। তার বিরহ যন্ত্রণার অবসান হবে।

দৃঢ়সঙ্কল্প মুরারি একখানি শাণিত ছুরি তৈরি করাইযা রাখিলেন। সেই ছুরি দিয়ে তিনি গোপনে আত্মহত্যা করবেন। এই তার মনের বাসনা।

মুরারি দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে বসে আছেন, প্রভু এলেন তার বাড়ীতে। মুরারি তাঁকে দেখে কুণ্ঠিত ও ভীত হলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আসন দিয়ে প্রণাম করলেন।

প্রভু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মুরারির মুখপানে চেয়ে রইলেন একাগ্রে। যেন কি পাঠ করলেন তাঁর মুখে। তারপর আচম্বিতে মুরারিকে কাছে টেনে নিয়ে ভর্ৎসনার রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, মুরারি তোমার এই কাজ? প্রভুর মুখের ভাবে ও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠধ্বনিতে মুরারি হতচকিত। তাঁর

মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে এমনি তাঁব মুখের ভাব। মহাপ্রভুর প্রশ্ন যেন তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল।
মুবারি নির্বাক। নিস্পন্দ। পাথরের মূর্তির মত।
প্রভু তাঁর একখানি হাত চেপে ধরে আবেগ কম্পিত স্বরে বললেন, বলো তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না? তুমি আমাব বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করবাব ভয়ে আমাকে তোমাব বিরহ দিয়ে যাবে? এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিল? এই কি তোমার প্রীতিব রূপ?
প্রভুব কণ্ঠ অশ্রু ভাবাক্রান্ত। তাঁব কমলায়ত লোচন যুগল অশ্রুভাবে অবনত।
প্রভু কাঁদছেন।
মুবারিও কাঁদছেন।
অঝোব অশ্রুধাবায় দুজনেবই গণ্ড প্লাবিত।
দোবেব আড়ালে দাঁড়িয়ে মুবারিব স্ত্রী কাঁদছেন।
কেন কাঁদেন কেউ জানেন না।
—একটা কাজ কববি? প্রভু প্রশ্ন কবেন।
—নিশ্চয় কববো। আদেশ করো।
—ঠিক? প্রভু তাঁব হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের মাথায় স্থাপন করলেন। আবার বললেন, ঠিক তো?
—ঠিক। শপথের ভঙ্গিতে মুরারি উত্তর দিলেন।
—বেশ। ছুরিখানা আমায় এনে দাও। আর আমাকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কব এমন কাজ আব কখনো করবে না?
মুবারি প্রভুর চরণতলে লুণ্ঠিত হয়ে আবেগ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, তোমার বিরহেব কল্পনা আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছিল। আমাকে ক্ষমা করো। তোমায় ছেড়ে যাবো কোথায়?
আবার সেই অঝোর কান্না। দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করলেন।

* ষষ্ঠ পল্লব *

"শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে গেলো ভেসে।"

সে কিসের প্লাবন? উচ্ছ্বসিত জলরাশির আবর্ত নয়। গঙ্গার স্ফীতি নয়।

গৌরাঙ্গদেবের প্রেম ও ভক্তির বন্যায় নদে গেল ভেসে। সে এক পরমাশ্চর্য অনুভূতি। এক নতুন মধুর রসের আস্বাদে নদেবাসীরা পাগল হয়ে উঠল। ঠিক পাগল না হলেও মাতাল হয়ে উঠল। কূলভাঙ্গা নদীর মত তখন নদীয়ার অবস্থা। প্রেমের গাঙে বান ডেকেছে। নদে বুঝি ভেসে যায়।

"প্রেমে দু-কূল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরাচাঁদের গায়।"

সে প্রেমের রূপ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এর রস আস্বাদন না করলে এর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না মদ না খেলে যেমন মদের স্বাদ অনুভব করা যায় না। কৃষ্ণপ্রেমও তেমনি অননুভূত।

সে এক পরমাশ্চর্য পরম আনন্দময় আকুতি।

আমি তোমার হলেম বলে ভগবানে সর্বসমর্পণ।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" সেই শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হওয়ার নামই কৃষ্ণপ্রেম। সেই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা নবদ্বীপবাসী।

সারা নবদ্বীপবাসী রাতারাতি কৃষ্ণপ্রেমিক হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণপ্রেমে ঝলমল করছে নবদ্বীপ।

একজন দুজন নয়। সারা নবদ্বীপের লোক যেন মেতে উঠেছে। প্রেমসুধা পান করে।

শ্রীগৌরাঙ্গের আনা এই প্রেমসুধা। বিতরণ করছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ গৌরাঙ্গ ভক্তগণ।

বিতরণে কার্পণ্য নেই। প্রেমের অনন্ত অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে

দিয়েছেন প্রেম কল্পতরু মহাপ্রভু। যে চায় সেই পায়। যে চায় না সে-ও পায়। হরিরলুটের বাতাসার মত নিত্যানন্দ সকলকে ডেকে ডেকে দেন : তোরা কে নিবি আয়। ওরে আয়। প্রেম-নদী থেকে এক কলসী জল তুলে নিয়ে যা। সকলের মাথায় দে। নিজের মাথায় দে, ধন্য হ।

শ্রীগৌরাঙ্গ সারা নদীয়ার মহাপ্রভু। সারা নদেকে তিনি জয় করে নিয়েছেন। প্রেম দান করে। সকলেই একটা অনাস্বাদিত বিমলানন্দে ভাসছে প্রভুর কৃপায়।

ভক্তগণের হৃদয় প্রেমে ভরপুর। সেই প্রেম তাঁরা একা ভোগ করতে চান না। অপরকে তার ভাগ দিতে চান। অপরকে সুখী করাই যে প্রভুর ধর্ম।

সারা নবদ্বীপ ও বাঙলা তখন গৌরাঙ্গ পাগল।

তখনকার নবদ্বীপের অবস্থা শ্রীলোচনদাস তাঁর শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে এই পদটিতে প্রকাশ করেছেন :

"সুখেরি পাথার নদীয়ায়,
গোরাচাঁদের উদয়।
একদিন নয় দুদিন নয়, নিতুই নূতন।
(সুখেরি পাথার।)
মনে করি নদে ভরি এ দেহ বিছাই।
তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই ॥"

ভক্তগণ যাকে পাচ্ছে তাকেই দলে টেনে নিচ্ছেন। প্রেমমন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছেন।

দিন দিন ভক্তের দল বাড়ছে। বানের জলের মত। তার দেবদুর্লভ রূপ দেখে ও তাঁর শ্রীমুখের কীর্তন শুনেই সকলে তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠে। দূর থেকে দর্শন করেই তাঁকে সর্ব সমর্পণ করে। যারা ভাগ্যবান তারা তাঁর স্পর্শ পায়। তাঁর কাছে যেতে পারে।

কারুকে স্পর্শ দিয়ে, কারুকে আলিঙ্গন দিয়ে, কারুকে হাসি ও করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহাপ্রভু অভয় দেন।

দর্শনার্থীর ভিড়ে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন।

ভক্তের প্রতি তাঁর অশেষ করুণা। ভক্তের প্রগাঢ় ভক্তিই ভগবানের আসন টলিয়ে দেয়। ভগবানকে বিচলিত করে তোলে।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তেরা "জনে জনে নারায়ণ"। তাদের অচল ভক্তি মহাপ্রভুকে মাঝে মাঝে কুণ্ঠিত ও ভাবিত করে তোলে।

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের মত ভক্তেরাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে অভিহিত করেন এবং তাঁর মহিমা বিস্তার করেন। প্রচার করেন তার নতুন মতবাদ। তাঁর "নাম-মন্ত্র"।

শ্রীনিত্যানন্দকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় সত্তা বলা চলে। প্রেম, ভক্তি ও দয়ার অবতার রূপে তিনি গৌরাঙ্গদেবের প্রধান পার্শ্বচর হয়ে তাঁর হাত ধরেন। ভাবে ভঙ্গিতে ও প্রাণমাতানো নৃত্যের আবেশে তিনি নবদ্বীপকে উত্তরোল করে তোলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের পাশে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর অভূত-পূর্ব ব্যাপার।

একসঙ্গে দুজনে পরামর্শ করে যেন অমৃতরাজ্য হতে অবতীর্ণ হলেন এই ধূলিমলিন মর্তভূমে।

নবদ্বীপবাসীর সৌভাগ্য ও সুকৃতি অবধারিত।

যুগে যুগে তিনি আসেন সাধুদের পরিত্রাণ করতে। এসেছেন বহুবার। কিন্তু এমন ভাবে জুড়ি মিলিয়ে দয়ার সাগর-মন্থনকরা অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে একত্রে একসঙ্গে আর কখনো অবতীর্ণ হয়েছেন বলে জানা নেই।

শ্রীগৌরাঙ্গের সাথে শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে আবির্ভাব এক অত্যাশ্চর্য অভাবিত ঘটনা।

এ পূর্ব-পরিকল্পিত শ্রীভগবানের লীলা-মাধুরী। নবদ্বীপের প্রতি তাঁর

সবিশেষ কৃপা ও করুণা। এ যেন দুটি ভায়ে পরামর্শ করে শ্রীবৃন্দাবন থেকে হাওয়া বদলাতে এলেন, সুরধনিকূলের এই নবদ্বীপে।
নবদ্বীপকে কেন তাঁরা মনোনীত করলেন তারাই জানেন!
অসমাপ্ত ব্রজলীলা সমাপ্ত করতে এলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে।
ধন্য নবদ্বদীপ! ধন্য এর দেশবাসী। এ তাদের যুগ-যুগান্তের সাধনার পুরস্কার।
এ তাদের অনাদিকালের কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তির মহিমা।
তখনকার নবদ্বীপের অবস্থা উৎক্ষিপ্ত ও উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের মধ্যে কাষ্ঠখণ্ডের মত টলমল করছে। ভক্তি ও প্রেমের অনন্ত সমুদ্র।
শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে এসেছেন শ্রীবৃন্দাবনকে সঙ্গে করে নিয়ে।
ব্রজলীলার অনাস্বাদিত রসপান করাচ্ছেন নদেবাসীকে। ব্রজবাসীর ভক্তি ও প্রেমের মাধুর্য অস্বাদ করাচ্ছেন তাদের।
কোন কিছুই বিস্মৃত হন নি। সেই জলকেলি। সেই নৌকাবিলাস।

ভক্ত বাড়ে দিনে দিনে। সকলকে সেই একই উপদেশ দেন মহাপ্রভু, হরে-কৃষ্ণ নাম জপ কর। আর দশে-পাঁচে মিলে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সঙ্গে নিয়ে কীর্তন করো।
মহাপ্রভুর আদেশ ও উপদেশকে ঈশ্বরের উপদেশ ভেবে অবনত মস্তকে সকলে গ্রহণ করে।
শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী বেদবাক্য। তাঁর আদেশ শিরোধার্য।
সন্ধ্যা হতেই বাড়ী বাড়ী মৃদঙ্গ করতাল ও হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। আলো ঝলমল নাগরী উৎসব ও সঙ্গীত মুখর হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে কীর্তন শুরু হয়। আবেশের ঘোরে সকলে নৃত্য করে। সকলে একসঙ্গে নাচে। তারা আনন্দে নাচে গায়। পরমানন্দ আনন্দঘন অদৃশ্য মহাশক্তি তাদের হাত ধরে নাচায়।

"সূর্য নাচে, চন্দ্র নাচে আর নাচে গোরা।
পাতালে বাসুকী নাচে হইয়া বিভোলা॥"

সকলেই প্রেমে মাতোয়ারা। তাদের মনে হয় বিশ্বভুবন তাদের সঙ্গে নাচছে।

সে এক অদ্ভুত উন্মাদনা! প্রেমের আবেশে তখন সকলেই মত্ত ও দিশাহারা। তাদের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত। এই আবেশের মধ্যেই তাদেব সর্ব-সমর্পণ।

আর কোন চিন্তা নাই, কোন বন্ধন নেই। ভগবৎ চিন্তায় হরি নাম উচ্চাবণ কবেই তারা খালাস। সেই তাদের অস্তিত্বের পরমার্থ। সংসারবন্ধন, জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চা ভুলে তারা নামামৃত পান কবে আকণ্ঠ। দিবারাত্র। সকলের মুখে হবিধ্বনি কাজে অকাজে। নিদ্রায় ও জাগবণে।

পথ চলতে চলতে পথিকেরা 'হরি-হরি' বলে। স্বামীর কাছে শুয়ে স্ত্রী হরি-হরি বলে। শিশু কাঁদে হবি-হবি বলে। নবদ্বীপ হরিময় হয়ে ওঠে। আকাশে বাতাসে হরিধ্বনি। গাছের চূড়ায় পাখিবা হরিধ্বনি কলরব করে। হবি হরি রবে সুরধনি কলধ্বনি করে।

নবদ্বীপ হয়ে ওঠে স্বপ্নের দেশ। ভক্তি ও ভক্তের রাজ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাদের ইষ্টদেবতা। ভগবানের সঙ্গে একত্র বাস করার সৌভাগ্য যাবা অর্জন করে তারা ধন্য।

মহাপ্রভু সদাই ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। সব সময় সকলে তাঁর দর্শন পেত না। সকলের অধিগম্য নন, অনেককে দূর হতে দর্শন করেই সরে পড়তে হত। কাছে যেতে সকলের সাহস হত না। তাঁর জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বকে অনেকে ভয় করত। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করবার সাহস পেত না। অনেকে সেই আক্রোশে তাঁর নিন্দা করত। তাঁকে ভণ্ড বলত। তাঁর দর্শন ও কীর্তন শ্রবণ অভিলাষী এক ব্রাহ্মণ তাঁর দর্শন ও কীর্তন শ্রবণে বঞ্চিত হয়ে নিজের যজ্ঞ

উপবীত ছিঁড়ে তাকে অভিশাপ দেন, তুমি সংসার-সুখ থেকে বঞ্চিত হবে।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তার ছিন্ন উপবীত মাথায় তুলে নিয়ে বললেন, তোমার অভিশাপ গ্রহণ করলাম।

এমনি দুষ্ট-প্রকৃতির ও ক্রোধপরবশ লোকে মাঝে মাঝে প্রভুকে ত্যক্ত ও বিদ্রূপ করতো। বলতো, ছেলেটা ছিল ভাল, দেশের লোকে ওকে ভগবান বানিয়ে ওর মাথা বিগড়ে দিলে।

* সপ্তম পল্লব *

শ্রীবাস অঙ্গনের নিশীথ কীর্তনান্তে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলেন, চল, শান্তিপুরে যাই।

নিত্যানন্দ তো ঢেউয়ের আগে ফেনা।

প্রভুকে সঙ্গ দেবার জন্য তিনি সদা উন্মুখ ও ব্যগ্র। নিত্যানন্দ বলেন, তথাস্তু।

ভোরে শচীদেবীকে বলে দুজনে শান্তিপুর যাত্রা করলেন।

পথের ধারে গঙ্গাতীরে একখানি ঘর দেখে প্রভু নিতাইকে প্রশ্ন করেন, ও কার ঘর জানো ?

—একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর।

নিতাই উত্তর দেন।

মহাপ্রভু কৌতুক করে বলেন, গৃহস্থ সন্ন্যাসী ? চলো, দেখে আসি। দুজনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। দেখলেন গৃহমধ্যে এক প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ যুবক উবিষ্ট। অঙ্গে বা বেশভূষায় সন্ন্যাসের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। না আছে জটা-বল্কল, না আছে অঙ্গে ভস্মর বিভূতি।

নিতাই তাকে নমস্কার করলেন। ব্রাহ্মণ যুবক প্রতিনমস্কার করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি আশীর্বাদ করলেন, তোমার ধন হোক। বিদ্যা হোক। ভালো বিবাহ হোক। যশস্বী পুত্র হোক।

—এ কি আশীর্বাদ করলেন গোঁসাই ? এ নিষ্ফল আশীর্বাদ নিয়ে আমি করবো কি ? আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমি কৃষ্ণ-দাস হই।

প্রভুর জ্যোতির্ময় রূপমাধুরী ও দৈহিক গঠন সন্ন্যাসীকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করে এবং তিনি আন্তরিক আশীর্বাদ করেন, কিন্তু প্রভুর কথার তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন না বা কৃষ্ণ-দাস কাকে বলে তিনি জানেন না।

কাজেই তিনি কুণ্ঠিত ও ব্যথিত হলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, ভালো বললে গালি দেয় এমন লোক আছে শুনেছিলাম, আজ চোখে দেখলাম। কেন বাপু, এর চেয়ে ভালো আশীর্বাদ আর কি করতে পারি? এ সব ছাড়া পৃথিবীতে আর কি-বা কাম্য?

প্রভু বিনীত স্বরে উত্তর দেন, এ সব সুখ চিরস্থায়ী নয়? জরা আছে। মৃত্যু আছে। তখন এ আশীর্বাদের মূল্য কি? বরং আমায় আশীর্বাদ করুন, কৃষ্ণ' চরণে আমার মতিগতি হোক। এবং জরা ও মৃত্যু থেকে যেন অব্যাহতি পাই।

সন্ন্যাসী আরো ক্রুদ্ধ হলেন। বলেন, আমি সন্ন্যাসী। আমি সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করেছি। এমন কথা তো কারুর মুখে শুনিনি। কালকের শিশু আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে আসে। অর্বাচীন!

নিত্যানন্দের বুঝতে বাকি রইল না গতিক মন্দ। তিনি সন্ন্যাসীকে বলেন, বালকের কথায় আপনি ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি দর্শনমাত্রেই আপনার মহিমা বুঝতে পেরেছি।

সন্ন্যাসীর ক্রোধ উপশম হল। তিনি নিত্যানন্দকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন।

ধ্রুব ও উপস্থিত ত্যাগ করবার পাত্র নিত্যানন্দ নন। তিনি স্বীকার করলেন।

সন্ন্যাসী তাঁদের জলযোগের ব্যবস্থা করতে ভিতরে গেলেন।

সন্ন্যাসীর স্ত্রী পরম সুন্দর অতিথি দুটিকে দেখে হৃষ্টচিত্তে তাঁদের জলযোগের ব্যবস্থা করে দিল।

সেটা বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস। আম, কাঁঠাল ও গরম দুধ দিলেন।

প্রভু ও নিতাই স্নান করে জলযোগে বসলেন।

তাঁহারা জলযোগে বসলে সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দকে উদ্দেশ করে

জিজ্ঞাসা করেন, কিছু 'আনন্দ' আনবো কি ?
সন্ন্যাসীর অন্তরালবর্তিনী স্ত্রী তাঁকে শাসালেন, ওঁদের ত্যক্ত করো না। স্বচ্ছন্দে আহার করতে দাও।
নিতাই বিব্রত হয়ে ওঠেন।
সন্ন্যাসী স্ত্রীর কাছে গেলে প্রভু নিতাইকে জিজ্ঞেস করেন, 'আনন্দ' কাকে বলে ?
নিতাই বলেন, 'আনন্দ' মানে 'মদ'।
শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! বলে তৎক্ষণাৎ আচমন করে প্রভু উঠে পড়েন এবং সন্ন্যাসী বাইরে আসবার পূর্বেই দ্রুতপদে বাহির হয়ে গেলেন।
সন্ন্যাসী তাঁর পশ্চাদনুসরণ করছে দেখে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।
নিতাইও তাঁর দেখাদেখি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
উভয়েই সন্তরণ-পটু। দুজনে সাঁতার দিয়ে শান্তিপুরের দিকে ভেসে চললেন। শান্তিপুর বেশী দূর নয়। অনুকূল স্রোতে গা ভাসনি দিয়ে দুজনে শন্তিপুর চললেন।
এখনও নিতাই জানে না প্রভু কেন শান্তিপুর যেতে চান।
মাঝপথে প্রভুর শরীরে ভগবান প্রকাশ পেলেন। তাঁর শরীর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। তিনি নিতাইকে বলেন, নাড়া আবার জীবকে (অদ্বৈতকে প্রভু নাড়া বলতেন) জ্ঞানশিক্ষা দিচ্ছে। আমি আজ তাকে এমন জ্ঞানশিক্ষা দেব যে জীবনে ভুলবে না।
নিতাই নিরুত্তর। নিঃশব্দে ভেসে চললেন। অতঃপর কিছুক্ষণ পরেই উভয়ে অদ্বৈত আচার্যের ঘাটে উঠে তাঁর আবাসে গেলেন সিক্ত বসনে, আর্দ্র দেহে।

আচার্য রত্ন পাঠনিরত শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন।
প্রভু ও নিতাই প্রবেশ করলেন। প্রভুর তখন প্রকাশ অবস্থা।

সন্ত অবগাহিত স্নিগ্ধ নির্মল শরীরে জ্যোতির্ময় প্রভা। দেহের উৎসারিত আলোকচ্ছটায় সমস্ত ঘরখানা ভরে গেল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করেছেন:

"বিশ্বম্ভর তেজ যেন কোটি সূর্যময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়॥"

অন্তরালবর্তিনী অদ্বৈত-ঘরনী দূর থেকে প্রভুর মুখভাবে ভীত ও চিন্তিত হলেন।

অদ্বৈত পুত্র অচ্যুত প্রভুর চরণে প্রণত হল। হরিদাসও প্রভুর চরণতলে ভূমিষ্ঠ হলেন। প্রভু সরাসবি অদ্বৈতকে প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে নাড়া, তুই নাকি ভক্তিকে অবহেলা করছিস?

প্রভুর অলৌকিক তেজোময় কণ্ঠধ্বনি অদ্বৈতকে অবশ করে দিল। যদিও অদ্বৈতর মাঝেও ঐশীশক্তি বর্তমান তবুও তিনি তটস্থ হয়ে সঙ্কুচিত। মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, বিচলিত ও কুণ্ঠিত স্বরে অদ্বৈত উত্তর দেন, চিরদিনই জ্ঞান বড়। ভক্তি স্ত্রীলোকের ধর্ম। জ্ঞান বিনা ভক্তি কি করতে পারে?

প্রভু এ কথার কোন উত্তর দেন না। অতর্কিতে অদ্বৈতকে উঠানে ফেলে দিয়ে তাঁকে কিল, চড় ও ঘুষি মারতে আরম্ভ করলেন। বললেন, এখনো বল, ভক্তিকে আর অবজ্ঞা করবি না তো?

সকলে প্রভুর পানে বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে রইলেন। হরিদাস ভয়ে কাঁপছেন। নিতাই অবাক হয়ে গেছেন।

অন্যান্য সকলেও হতচকিত ও হতবাক। গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী অস্ফুট কাতর ধ্বনি ও হায় হায় করছেন।

—বুড়োকে মেরো না, মরে যাবে, ইত্যাদি কাতর অনুনয় করছেন ও প্রভুকে শাসাচ্ছেন।

সীতাদেবী ভয়ে তখন আত্মহারা। পূর্বকথা বিস্মৃত হয়েছেন। উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রভুর কাণ্ড দেখে। কিন্তু

তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল অদ্বৈতর ভাব দেখে। তাঁর মুখে এতটুকু কাতরতা নেই। ব্যথা-বেদনার কোন চিহ্ন নেই। তিনি নিশ্চন্ত আরামে পড়ে পড়ে মার খেলেন। প্রভুর প্রহার যেন তাঁকে আরাম ও আয়াস দিল। তাকে স্বস্তি দিল। প্রতিটি আঘাত যেন তাঁকে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব নতুনতরো আনন্দের স্বাদ দিল। তাঁর মুখের প্রতিটি রেখায় আনন্দ উথলে পড়ল।

অদ্বৈত উঠে দাঁড়িয়ে আঙিনায় নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে তিনি কণ্ঠে ভাষা পেলেন। কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল, মহাপ্রভুর প্রশস্তি বন্দনায়।

নিজেকে ভাগ্যবান মনে হল। বললেন, তোমাকে আর কি বলবো। অধমকে তোমার এত দয়া। তোমাকে আমি প্রণাম করি।

আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে প্রভুর চরণে প্রণত হলেন। এবং স্বহস্তে তাঁর চরণকমল দুখানি মাথায় তুলে নিলেন।

তারপর করতালি দিয়ে উঠানময় নৃত্য করতে করতে বলেন, চেয়ে দেখ ত্রিলোকবাসী জনগণ। আমার প্রভুর কৃপা দেখো। আমি প্রভুকে ছেড়ে এলাম, কিন্তু প্রভু আমাকে ছাড়লেন না। আমার বাড়ী এসে আমাকে জোর করে কাছে টেনে নিয়ে কৃপা করলেন। প্রভুর প্রহারে আমার ত্রিতাপ দূর হয়ে গেল।

সবিস্ময়ে সকলে চেয়ে দেখল অদ্বৈত যেন প্রভুর স্পর্শ পেয়ে হঠাৎ রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তাঁর দেহ থেকে একটা দৈবী জ্যোতি নির্গত হল। তাঁর দেহের ছন্দ বদলে গেল। রূপ বদলে গেল।

অদ্বৈত যখন প্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়েন, সেই সময় ভগবান অন্তর্ধান করলেন। পদতলে অদ্বৈতকে দেখে মহাপ্রভু সলজ্জ ভঙ্গিতে জিভ কেটে বলেন, শ্রীবিষ্ণু! গোঁসাই করেন কি? আমাকে কেন এমন দুঃখ দিচ্ছেন?—এই বলে তিনি অদ্বৈতকে প্রণাম করেন। তারপর প্রশ্ন করেন, গোঁসাই, আমি কোন অসঙ্গত ব্যবহার করিনি

তো? সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে বলেন, আমি তোমার সন্তান। অচ্যুত যেমন, আমিও তেমনি। আমাকে তোমার সদা সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

প্রভুর কথা শুনে হরিদাস ও নিতাই মৃদু হাস্য করলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। তখনো আচার্যের স্নানাহার হয়নি। বলেন, বেলা হয়েছে। দুটো অন্ন তো মুখে দিতে হয়। চল আবার স্নানে যাই। সমস্ত অঙ্গ কর্দমাক্ত। প্রভুর আক্রমণে অঙ্গনে লুটোপুটি খেয়ে তাঁর দেহ ধূলিধূসরিত।

প্রভু বলেন, চল স্নানে যাই। মা কোথায়? তাঁকে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের ভোগের ব্যবস্থা করতে বলুন। বড় খিদে পেয়েছে।

খিদের অপরাধ কি? এই দীর্ঘ পথ গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে এসেছেন তারপর অদ্বৈতর সঙ্গে ঝটাপটি করেছেন। খিদে পাবে বই কি?

সীতাদেবী-মা তখন পরমানন্দে ভিতরে নানাবিধ মুখরোচক দেবভোগ্য সামগ্রী রন্ধন করছেন। পূর্ব-কথা বিস্মরণ হয়েছেন।

প্রভু, অদ্বৈত, হরিদাস ও নিত্যানন্দ গঙ্গা স্নানে গেলেন।

সেখানেও এক প্রস্থ জলকেলি হল। ভক্তদের কাছে পেলে ভগবান স্থির থাকতে পারেন না।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে প্রভু সরাসরি ঠাকুরঘরে গেলেন এবং সাষ্টাঙ্গে যুগল-বিগ্রহের চরণে প্রণত হলেন। অদ্বৈত গিয়ে প্রভুর চরণে প্রণত হলেন। হরিদাস থাকতে পারলেন না। তিনি গিয়ে অদ্বৈতর চরণে ভূমিষ্ঠ হলেন

সে এক অনির্বচনীয় অভূতপূর্ব দৃশ্য। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভগবতে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন: ধর্মের সেতুবন্ধন হল। সামনে রাধাকৃষ্ণ। পরে অদ্বৈত। পশ্চাতে হরিদাস। সকলে একত্রে একসঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হয়ে যুগলমূর্তির উপাসনা করলেন.।

অতঃপর ভোজনপর্ব। সকলে একসঙ্গে ভোজনে বসলেন।

প্রভু যে ইতিমধ্যে অদ্বৈতকে প্রহার করেছেন তার বিন্দুমাত্রও মনে নাই।

সীতাদেবীরও মনে নাই যে তিনি প্রভুকে দুর্বিনীত বাক্য বলেছেন।

পরমানন্দে হাসি কৌতুকের মধ্যে সকলে ভোজন করেন। সীতাদেবী পরিবেশন করেন।

অদ্বৈতর পেছনে লাগা নিতায়ের চিরদিনেব স্বভাব। ভোজন শেষ হবার পূর্বেই তিনি ঘরে অন্ন ছড়াতে লাগলেন।

নিতাই বলেন অদ্বৈত শুচিবায়ুগ্রস্ত। নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়িয়ে তাঁর সেই শুচিতাকে বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে চান।

নিতায়েব এই উদ্ধত ও দুর্বিনীত ব্যবহাবে ক্রুদ্ধ হয়ে অদ্বৈত ঝড়েব মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর পশ্চাতে নিতাই অট্টহাস্য কবলেন।

অদ্বৈত তাঁকে গালাগালি দিলেন। দুজনে খানিক বচসা ও বাকবিতণ্ডা হল।

সকলে আনন্দ উপভোগ করে হাসাহাসি কবলেন।

খড়ের আগুন। জ্বলতেও যতক্ষণ। নিভতেও ততক্ষণ। আগুন নিভে গেল। দুজনে আবার হাসিমুখে কোলাকুলি কবলেন।

শান্তিপুরের পরপারে কালনা।

সেখানে গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস।

কাছাকাছি কোন গ্রামে তাঁব বাস ছিল। তিনি গৃহত্যাগ করে গঙ্গাতীরের এই নির্জনতায় আসেন সাধন ভজন করতে।

প্রভু একাকী কারুকে কিছু না বলে শান্তিপুর থেকে সেখানে শুভাগমন করলেন।

গৌরীদাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না।

প্রভুর জ্যোতির্ময় দেহ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। তাঁর স্কন্ধে একটি নৌকার বৈঠা। তাঁর দৈব আবির্ভাবে গৌরীদাস নির্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। আচ্ছন্নের মত তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন নিস্পলক নেত্রে।

প্রভুর কণ্ঠ উচ্চারিত হল। বলেন, আমি শান্তিপুরে এসেছিলাম। একখানা নৌকায় চড়ে এই বৈঠা দিয়ে নিজে বেয়ে এখানে এলাম। বৈঠাখানা ধর। এই বৈঠা দিয়ে তাপিত জীবদের ভবনদী পার কর।

—কে তুমি? তুমিই কি আমাদের সেই কাণ্ডারী?

মূর্ছাহতের মত অস্ফুট কণ্ঠে গৌরীদাস প্রশ্ন করেন।

—আমি নদের নিমাই পণ্ডিত। প্রভু উত্তর দেন।

গৌরীদাস আনত ভঙ্গিতে তাঁর চরণপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হতে যাচ্ছিলেন, প্রভু তাঁকে বুকে তুলে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ে প্রবেশ করলেন।

গৌরীদাসের মনে প্রভু সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল ছিল। তিনি তাঁর কথা লোকমুখে শুনেছিলেন। সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। আজ তাঁকে দর্শন করেই মনে হল ইনিই তাঁর ধ্যানের ও সাধনার বস্তু। ইনি তাঁর পরম প্রিয় পরমাত্মীয়।

বৈঠা হাতে নিয়ে গৌরীদাসের মনে ভাবের তরঙ্গ ওঠে।

বৈঠা পেলেন, নৌকা আছে কিন্তু সে নৌকা বইবার শক্তি কোথায়? প্রভুর স্পর্শে ও আলিঙ্গনে সে শক্তি তিনি লাভ করলেন।

দয়ালু কৃপাময় ভগবান নিজের হাতে বৈঠা দিলেন। শক্তি তিনিই দেবেন। এর যেন মর্যাদা রাখতে পারি। মনে মনে উর্ধ্বনেত্রে তিনি সেই আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন।

গৌরীদাস গৌরাঙ্গভক্ত হলেন।

গৌরাঙ্গদেবের সেই বৈঠা আজো কালনায় সযত্নে রক্ষিত আছে। গৌরীদাসের শিষ্যেরা সেটিকে বিগ্রহের মত চিরদিন পূজা করে এসেছে।

* অষ্টম পল্লব *

গঙ্গার তীরবর্তী অখ্যাত গ্রামসমূহে শ্রীগৌরাঙ্গের এমনি যে কত শত মধুর লীলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কে তার খবর রাখে? ভূগর্ভে কোথায় কোন রত্ন প্রোথিত ও লুক্কায়িত আছে কে তার সন্ধান রাখে?

প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলতে পারেন।

গঙ্গাবক্ষে জলকেলি ও নৌকাবিহার করতে করতে কোথায়, কখন, কোন্ গ্রামে যে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব হত, পরম ভক্ত পার্ষদরাও জানতে পারতেন না।

তিনি নির্জনতা ভালোবাসতেন। নির্জন পল্লীপথে একা ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন। ভাবের ঘোরে তিনি যেন শূন্যে উড়ে বেড়াতেন। ভক্ত পার্ষদদের সঙ্গে কীর্তন করতে কবতে হঠাৎ কোথায় যে অন্তর্হিত হতেন কেউ তাঁর সন্ধান পেতেন না।

নবদ্বীপের সন্নিকটে জাহান্নগর নামে গ্রাম। সেখানে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর বিগ্রহ ছিল।

সেই গোপীনাথের সেবার ভার ছিল সারঙ্গদেব নামে এক প্রাচীন সাধু ব্রাহ্মণের উপর। ইনি উদাসীন এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরম ভক্ত।

একদিন প্রভু সেখানে উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধ সারঙ্গদেবকে বলেন, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ। গোপীনাথের নিয়মিত সেবার জন্য একটি শিষ্য গ্রহণ করা কর্তব্য।

সারঙ্গদেব উত্তর দেন, আমিও সে কথা ভেবেছি কিন্তু মনোমত শিষ্য সংগ্রহ করা একটা সমস্যা।

প্রভু আদেশের কণ্ঠে বলেন, না না। তুমি একজন শিষ্য গ্রহণ কর সারঙ্গ।

—আপনার আদেশ অবশ্য পালন করবো। কিন্তু শিষ্য নির্বাচন করবার শক্তি আমার নাই।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর সাবঙ্গদেব বলেন, আপনার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবো না। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে যাব মুখ দেখবো তাকেই শিষ্য কববো।

মৃদু হাস্য করে প্রভু বলেন, তাই করো।

সাবঙ্গদেবের রাত্রে নিদ্রা নাই। এ আবার কী ফ্যাসাদ ? উদাসীন সাবঙ্গদেব চিন্তিত হন। শিষ্যের প্রতি স্বভাবতঃ বাৎসল্যের উদ্রেক হয়। প্রভু আবার তাহাকে মায়া বিজড়িত কবতে চান নাকি ?

অথচ প্রভুব আদেশ অমান্য করা চলে না। তাঁর কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সকালে উঠে প্রথম যার মুখ দেখবেন, তাকেই শিষ্য করবেন। ভাবনার অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে রাত পোহাল।

অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করে তিনি গঙ্গাতীরে বসে মালা করছেন। হঠাৎ জলের ঢেউ এসে তাঁর কোলের উপর আছড়ে পড়ল।

তখন অরুণোদয় হচ্ছে। তাঁ মনে হল তরঙ্গ একটা ভারী পদার্থ এনে তাঁর কোলে তুলে দিয়েছে।

উদয়োন্মুখ সূর্যের স্তিমিত আলোকে তিনি চোখ মেলে দেখেন তাঁর কোলের উপর একটি বালকের শবদেহ। বিস্মিত আতঙ্কে তিনি শবদেহেব পানে নিরীক্ষণ করলেন।

দশ এগারো বছর বয়সের একটি পরম সুন্দর বালক। দেহের বর্ণ উজ্জল গৌর। মুণ্ডিত মস্তক। কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত। পরনে পট্টবস্ত্র। বালক তার বিস্মৃত বাৎসল্যকে উতরোল করে তুলল। তাব মনে পড়ল প্রভুর কাছে তার প্রতিশ্রুতির কথা। 'প্রভাতে উঠে যার মুখ প্রথম দেখবো তাকেই শিষ্য করবো'। এ বালক যদি জীবিত হত তাহলে তিনি আনন্দিত মনে একে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য

করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ মৃত।

তিনি সংশয় দোলায় দুলতে থাকেন। কর্তব্য স্থির করতে পারেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, জীবিত কি মৃত যাই হউক প্রভুর কাছে তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে নির্বিচারে।

তারপর যন্ত্রচালিতের মত অবনত মস্তকে ক্রোড়স্থ শবদেহের কানে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

মন্ত্র উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বালকের দেহে জীবনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হল।

গঙ্গাতীরে তখন স্নানার্থীর ভিড় জমেছে। তারা বিস্মিত হয়ে সেইদিকে চেয়ে দেখছে। বালক নয়ন মেলে দেখল। তারপর সারঙ্গদেবকে ধরে উঠে বসল।

সমবেত স্নানার্থীর দল হরিধ্বনি কবে উঠলেন।

তারপর তাকে সারঙ্গদেবের আবাসে নিয়ে যাওয়া হল।

বালককে সঙ্গে নিয়ে সারঙ্গদেব বাড়ী ফিরে দেখেন, তাঁর বাড়ীতে সপার্ষদ মহাপ্রভু উপস্থিত।

সারারাত্রি শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন করে এরই মধ্যে তিনি এখানে এসে পৌছলেন কেমন কবে বুঝে উঠতে পারেন না।

মহাপ্রভু বলেন, ওঁদের তোমার শিষ্য দেখাতে নিয়ে এলুম। শিষ্য ভালো হয়েছে তো?

কীর্তন শেষে মহাপ্রভু ভক্তদের বলেন, চলো, সারঙ্গদেবের শিষ্য দেখে আসি এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে সারঙ্গদেবের বাড়ীতে আসেন। সারঙ্গদেবেব দুনয়ন অশ্রুধারায় প্লাবিত। তিনি প্রভুর চরণতলে লুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং বালকটিকে তাঁর চরণতলে স্থাপন করলেন।

—একে আশীর্বাদ করুন প্রভু! এর মমতায় আমি অভিভূত।

প্রভু সদলবলে সেইখানে উপবেশন করেন। বালক অবনত মস্তকে

তাঁর চরণতলে উপবেশন করে।

মহাপ্রভু বালককে প্রশ্ন করেন, বৎস। তুমি কে? এবং এখানে কেমন করে এলে এঁদের সব বল।

বালক সকলকে প্রণাম করে বলে, আমার বাড়ী সরগ্রামে। আমরা গোস্বামী। সম্প্রতি আমার পৈতে হয়েছে। তাই মুণ্ডিত মস্তক। রাত্রে আমায় সর্প দংশন করে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমাকে মৃত ভেবে বোধ হয় আমাদের গাঁয়ের খড়ি নদিতে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর বর্ষার জলের তোড়ে ভাসতে ভাসতে গঙ্গায় এসে পড়ি। আমার বাপ-মা আছেন। আমাব নাম মুরারি।

মুরারি কাঁদে। ভক্তরাও চোখেব জল মোছে।

সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে পোড়াতে নেই বলে ছেলেটিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রভু মুরারিকে আশ্বাস দেন, তোমার জনক-জননী ও আত্মীয় পরিজন তোমায় দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। তুমিও নিশ্চয়ই তাঁদের দর্শন অভিলাষী। তোমাকে শীঘ্রই তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

মুরারি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, আমার পিতামাতা আমার জন্য ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন কিন্তু আমি আমার গুরুকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

সকলে বিস্মিত হল। সারঙ্গদেব লজ্জিত। অধোবদনে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে কাঁদতে লাগলেন।

সকলে বলাবলি করে: যেমন সারঙ্গ তেমনি তার শিষ্য। যেমন সারঙ্গ তেমনি তাঁর প্রভু।

সংবাদ পেয়ে মুরারির পিতামাতা আত্মীয় পরিজন ও গ্রামের লোক দলে দলে তাকে দেখতে এলো।

মৃতপুত্রকে ফিরে পেয়ে পিতামাতার উল্লাস ধরে না।

মুরারি কিন্তু পিতৃগৃহে ফিরে গেল না। উদাসীন ব্রত নিয়ে আজীবন

গুরুর ও গোপীনাথের চরণসেবা করল।

আরেকদিন ভক্তগণসহ পরিভ্রমণ করতে করতে মহাপ্রভু নবদ্বীপের উপান্তে বিদ্যানগর গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করেন। দেবানন্দ পরম সাধু। উদাসীন ও অদ্বিতীয় ভাগবত। মহা পণ্ডিত। কিন্তু ভক্তি মানেন না।

পূর্বকথা। ইতিপূর্বে একদিন দেবানন্দ ভাগবত পাঠ করছিলেন। সেখানে শ্রীবাস উপস্থিত ছিলেন। পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে ভাবাবেগে শ্রীবাস কেঁদে ওঠেন।

দেবানন্দের পড়ুয়ারা 'বামুন কাদে কেন? আমরা যে পাঠ শুনতে পাই না' বলে শ্রীবাসকে জোর করে ঘর থেকে বের করে দেন।

মহাপ্রভুর দেবানন্দকে দেখেই সে কথা স্মরণ হল। তিনি দেবানন্দকে বলেন, তোমার শিষ্যেরা প্রেম-বিগলিত রোরুদ্যমান শ্রীবাসকে বলপূর্বক ঘর থেকে বহিষ্কার করেছিল। যেমন গুরু তুমি, তেমনি তোমার শিষ্যগুলি। ভাগবত পড়ে রস পাও না, কারণ তোমার ভক্তি নেই। ভক্তি মান না। যে ভক্তি মানে না, তার ভাগবত পাঠে অধিকার নেই। পুঁথিখানা ছিঁড়ে ফেলে দাও।

প্রভুর অগ্নিমূর্তি দেখে দেবানন্দর ভয় হল। যদিও তার নিজের বাড়ী এবং শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত তথাপি তিনি আনত ভঙ্গিতে অপরাধীর মত নির্বাক হয়ে গেলেন।

স্নেহাস্পদকে মানুষ দণ্ড দেন। ভর্ৎসনা করেন। প্রভুর অন্তরে যে একবার প্রবেশের অধিকার পায় সেই তাঁর প্রিয় ও আপন হয়ে ওঠে। প্রভু যাকে প্রিয়জন মনে করেন, তাকেই ভর্ৎসনা করেন। কটু বাক্য বলেন। প্রয়োজন বোধে দণ্ড দেন। অদ্বৈতকে যেমন দণ্ড দিলেন। তাঁর ভক্তিকে অবজ্ঞা করার জন্য।

এ ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। দেবানন্দকে তাঁর মনের মাটি ভিজে না হলে বা তাঁকে আপনজন না ভাবলে প্রভু তাকে কটুকথা বলতেন না এবং এত বিচলিত হতেন না।

দেবানন্দ ভাগ্যবান। ভবিষ্যতের লীলাসঙ্গী পণ্ডিত দেবানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে আত্মসমর্পণ করে ভক্তির মহিমা কীর্তন করেন। জীবকে ভক্তি-শিক্ষা দেবার জন্য বা ভক্তির মহিমা বাড়াবার জন্য মহাপ্রভু মাঝে মাঝে ভক্তদের নিয়ে এমনি ভাবে নানা লীলাখেলা করতেন। শিক্ষা দেবার জন্য পরম অনুরাগী ভক্তকেও দণ্ড দিতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর মাঝের ভগবান স্বয়ং জীবকে শিক্ষা দেবার জন্য ও তাদের সাধনার পথ সুগম ও অবাধিত করবার জন্যই এ সব লীলাখেলা করতেন। অদ্বৈত ও দেবানন্দকে নিয়ে সেই খেলাই খেললেন। ভক্তির মহিমা প্রচার করলেন।

* নবম পল্লব *

মহাপ্রভুর প্রকাশ ও অপ্রকাশ অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

দুটি তাঁর বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন সত্তা। প্রকাশ অবস্থায় তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অপ্রকাশ অবস্থায় তিনি নিমাই পণ্ডিত। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। কাজেই প্রকাশ অবস্থার লীলার সঙ্গে অপ্রকাশ অবস্থার কার্যাবলীর কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যেত না। তাঁর সংলাপের কোন সূত্র বা অর্থ বিশ্লেষণ করা দুরূহ মনে হয়।

প্রকাশকালে বা কীর্তনের আবেশে তিনি অন্য জগতের। দূরের অদৃশ্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করতেন। কাছের লোক দূরে সরে যেত। অপ্রত্যক্ষ ও অদৃশ্য হত। তিনি অন্য জগতে বিচরণ করতেন। যে জগতের সঙ্গে মরলোকের কোন সম্বন্ধ নেই।

শ্রীঅদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দেখানো বা মুরারিকে বরাহরূপ দেখানো তাঁর প্রকাশ অবস্থা। তখন তিনি শ্রীভগবান। নিমাই পণ্ডিত সেখানে অগোচর বা অবান্তর।

অপ্রকাশ অবস্থায় মহাপ্রভু ভক্তদের অলৌকিক কোন কিছু দেখাতেন না বা দেখাতে ভালোবাসতেন না। তাঁর যত কিছু ঐশ্বর্য প্রকট হতো প্রকাশ অবস্থায় বা কীর্তনের আবেশে।

কীর্তনান্তে মহাপ্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীবাস অঙ্গনের অবারিত আকাশতলের মুক্ত বাতাসে বসে শ্রান্তি বিনোদন করতেন এবং ভক্তদের তত্ত্বকথা শোনাতেন।

সেদিন কীর্তন শেষে পরিশ্রান্ত মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীবাস

অঙ্গনের মাটিতে উবু হয়ে বসেন। তাঁর হাতে ছিল একটি আমের আঁটি।

কী ভেবে সেই আমের আঁটিটি অঙ্গনের মাটিতে রোপণ করলেন। এবং সামনে বসে ঘন ঘন করতালি দিতে থাকেন। বলেন, এই দেখ বীজ অঙ্কুরিত হল।

সবিস্ময়ে সকলে দেখলে অঙ্কুরিত বীজ পল্লব বিস্তার করল।

আবার তেমনি করতালি দেন আর বলেন, দেখ একটি গাছ গজাল।

তাই হল।

এইরূপে অল্পক্ষণ পরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সেটি মহীরুহে পরিণত হল।

আবার ঘন ঘন করতালি দেন আর বলেন। গাছে মুকুল ধরল। গাছে মুকুল ধরল। চ্যুত মুকুলের গন্ধে দিক আমোদিত হল।

এইভাবে মুকুলিত পল্লবে ফল ধরে। ফল বড় হয় এবং পাকে। রক্ত-পীত বর্ণের ফল। প্রভুর আদেশে গাছ থেকে গুনে তুশো ফল পাড়া হল।

আম পাড়া হলে হাত মুখ প্রক্ষালন করে প্রথম ফলটি শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দিলেন। পরে নিজে একটি ভক্ষণ করে বাকি ভক্তদের বিতরণ করেন।

রসাল সুমিষ্ট ফল। একটি ফলে একজনের পেট ভরে যায়। ফলে আঁশ নেই। আঁটি নেই।

ফলটি ভোজন করে প্রভু পরম পরিতুষ্ট হন। বলেন, এসো। দেখ আমার মায়া। যে উপায়ে এই ফলগুলি সৃষ্টি হলো তার সব কিছু চলে গেল। শুধু ফলগুলি রইল।

সকলে চেয়ে দেখে, গাছ অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রভু বলেন, এই রকম প্রেমধনই নিত্য বস্তু। কৃষ্ণসেবা করবার একমাত্র বস্তু। আর সব অনিত্য।

তখনও মাঝে মাঝে পড়ুয়া শিষ্যরা মহাপ্রভু সকাশে এসে পাঠ করতেন।

একদিন এমনি একটি শিষ্য প্রভুকে বলেন, আপনি যে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলেন, সে-ও তো একরকম মায়া বইতো নয়।

তাঁর কথা শুনে প্রভু অত্যন্ত বেদনা পেলেন। কথা উচ্চারিত হওয়ামাত্র তিনি হাত দিয়ে কান আবৃত করলেন এবং শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু বলে রোদন করলেন। পরে বলেন, চলো আমরা গঙ্গাস্নান করে আসি। কারণ কৃষ্ণ নাই একথা শুনে আমরা অপবিত্র হয়েছি।

সেই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলেন। সেখানে নিজে ডুব দিলেন এবং শিষ্যকে বহুবার ডুবালেন। ডুব দিয়ে তার অবিশ্বাস দূর হল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীবাস অঙ্গনের উন্মুক্ত আকাশতলে সংকীর্তনের আসর পাতা হয়েছে।

হঠাৎ মেঘে মেঘে দিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

বৃষ্টি নামবে।

পার্ষদরা বিষণ্ণ হলেন। কীর্তন বন্ধ রাখতে হবে।

আকাশ পানে চেয়ে প্রভু সহাস্যে বলেন, কোন ভয় নেই। বৃষ্টি হবে না। মেঘ কেটে যাবে। এইখানেই কীর্তন হবে।

প্রভু এক জোড়া মন্দিরা হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বমুখে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পানে চেয়ে মন্দিরা বাজিয়ে নাম করতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরেই আকাশ মেঘমুক্ত ও নির্মল হয়ে এল। কীর্তনের আসরের উপর আকাশ মেঘলেশহীন পরিষ্কার হয়ে গেল। আশ-পাশে বৃষ্টি হল।

মেঘনির্মুক্ত গগনতলে কীর্তন আরম্ভ হল

শ্রীগৌরাঙ্গকে সংসারের মাঝে প্রিয়জন পরিবেষ্টিত দেখলে শচীমাতার আনন্দের অবধি থাকে না।

কিন্তু অন্তঃপুরে থাকবার তাঁর সময় কোথা? সর্বক্ষণ তিনি ভক্ত-পার্ষদ পরিবেষ্টিত, সব সময় দর্শনার্থীর ভিড়।

ভোজনের সময় ভিন্ন অন্তঃপুরে তার দর্শন মেলে না। তাঁকে কাছে পাওয়া যায় না। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর অদর্শনে ব্যাকুল হন। কিন্তু উপায় কি? তার সময় কোথা? সময় তাঁর নিজের নয়। সব কিছুই তাঁর পরার্থে উৎসর্গীকৃত। সব কিছুই তাঁর জীবের কল্যাণের জন্য। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য।

সব কিছুই তাঁর জগতহিতায়।

তিনি ভগবান। তিনি ভক্তের। তিনি সর্বসাধারণের। কারুর আকুল আহ্বানকে তো তিনি অবহেলা ও অবজ্ঞা করতে পারেন না। তিনি ভক্তের কাছে বাঁধা। আর কোন বন্ধন তাঁর নাই। আর সকল বন্ধন মুক্ত তিনি। পরিবার বন্ধন, সমাজ বন্ধন, শাস্ত্র-বন্ধন এমন-কি দেহ-বন্ধন পর্যন্ত তাঁর অপুহিত হয়েছে। তিনি কারুর নন। অথচ তিনি সকলের।

কৃষ্ণ-নাম ছাড়া তাঁর শ্রীমুখে কোন বাণী নেই। 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' ব্যতীত কণ্ঠে কোন উচ্চারণ নেই।

সর্বক্ষণই তিনি কৃষ্ণরসে বিভোর। বিষ্ণুপ্রিয়া বা শচীকে সঙ্গ দেবার তাঁর অবসর কোথায়?

রাতভোর কীর্তন করে প্রত্যূষে বিশ্রাম করতে অন্তঃপুরে আসেন। সে-ও অতি অল্পক্ষণের জন্য।

নিদ্রা যান কি না-যান বোঝবার উপায় নেই।

নিমীলিত নেত্রে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই আবার ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েন। গঙ্গাস্নানে যান। ঠাকুর পূজা করেন তারপর বহির্বাড়ি কিংবা শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়ে দর্শনার্থীদের দর্শন দেন এবং ভক্তদের তত্ত্বকথা বলেন।

দর্শনার্থী ও ভক্তের দল হু-হু-চ্ছ্বাস বেড়ে চলেছে।

ভক্তেরা দর্শনমাত্রেই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে প্রণাম করে। তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে।

তারপরে বেলা দ্বিপ্রহরে প্রভু ভোজনে বসলে অন্তঃপুরবাসিনী প্রিয়জনরা তার দর্শন পান এবং কাছে পেয়ে তাঁকে ঘিরে কাছে বসেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে এসে দাঁড়ান। শচীমা তাঁকে পরিবেশন করেন। কাছে এসে বসেন। ভোজনের তদ্বির করেন।

বাৎসল্যে বিভোর হয়ে শচী বলেন, কাল আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি নিমাই!

মা স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন। তাঁদের ঘরের রঘুনাথ শালগ্রামশিলা কৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ করে তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন।

প্রভু হাস্যমুখে বলেন, ভালো স্বপ্ন। আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত মা। ভাল করে তাঁর নৈবেদ্যর ব্যবস্থা করো।

শচীমা পুত্রের কথার তাৎপর্য বুঝলেন কিনা কে জানে, তবে অদূরে উপবিষ্ট ভক্তগণ মৃদু হাস্য করলেন।

—মা! আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত! প্রভুর কণ্ঠের মধুর ধ্বনি ঘরের মাঝে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো।

আরেকদিন শচীমাতা কুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রভুকে বলেন, তোমাকে একটা কথা বলবো নিমাই! তুমি আমার ওপর রাগ করো না। আমি তোমার কাছে অপরাধী।

চমকে ওঠেন মহাপ্রভু: মা! আমি তোমার সন্তান বই আর কিছু

নই। সন্তানের কাছে মায়ের অপরাধ? সন্তানকে অপরাধী করো না মা।

অশ্রুভারাক্রান্ত রুদ্ধ স্বরে প্রভু বলেন এবং মায়ের চরণপ্রান্তে আনত হন।

মা বলেন, কথাটা তোমাকে বলব না ভেবেছিলাম কিন্তু না বলে পারলাম না।

শচীদেবীর কণ্ঠও বাষ্পারুদ্ধ। গদগদ। তিনি বলেন, কথাটা তোমার দাদা বিশ্বরূপের। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নেবার কিছুদিন পূর্বে আমার কাছে একখানি পুঁথি গচ্ছিত রেখে যায়। বলেছিল, নিমাই বড় হলে তাকে দেবে এবং পড়তে বলবে।

আমি নিতে চাইনি সেখানা। বলেছিলাম, তুমি বরং নিজের হাতে তাকে দিও। কিন্তু সে রেখে দেয় আমার কাছে।

তারপর যখন সে আমার বুকে শেল দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করে তখন আমি মনস্থির করলাম। পুঁথিখানা তোমাকে দেব না। ভয় হল, যদি সেটা পড়ে তোমার মনোভাব বদলে যায় বা তোমার কোন অকল্যাণ হয়। ভয়ে ভয়ে এতদিন সেখানা তোমায় দিই নি।

—বেশ! সেখানা কই আমাকে দাও।

প্রসারিত হস্তে ও ব্যাকুল কণ্ঠে সেখানা চাইলেন প্রভু।

শচীদেবীর মাথায় বজ্রাঘাত হল। তিনি বিচলিত অপরাধীর কণ্ঠে বলেন, সেখানা তো নেই বাবা। সেখানা আমি জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি। আমার মনে বড় ভয় হয়েছিল। পুঁথিখানা পড়ে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে উদাসীন হয়েছিল। পাছে সেই পুঁথি পড়ে তোমার মনে ঐরূপ ভাবান্তর হয়, সেই ভয়ে আমি এ কাজ করেছি। আমাকে ক্ষমা করো। আমার ওপর রাগ করো না।

প্রথমে দাদার স্মরণিকা পুঁথিখানি নষ্ট হয়ে গেছে শুনে মহাপ্রভুর চাঁদমুখখানি বিশুষ্ক ও মলিন হয়ে গেল কিন্তু পরক্ষণেই মায়ের ক্ষমা

প্রার্থনায় তিনি শ্রীবিষ্ণু। বলে জিভ কেটে মায়ের চরণতলে নত হয়ে বলেন, সন্তানের কাছে মা ক্ষমা চাইলে, সন্তানের অকল্যাণ হয়। ভুলে যেও না আমি তোমার পুত্র বই কিছু নই। তুমি বেশ করেছো। যা ভালো বুঝেছ করেছো।

মহাপ্রভুর মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। কণ্ঠ স্বচ্ছন্দ ও অবারিত হল।

আবার মার চরণে প্রণত হয়ে বলেন, তুমি স্বচ্ছন্দ হও মা। মনে কোন দ্বিধা রেখ না। সঙ্কোচ রেখ না। তোমার মন বাৎসল্যে অধীর।

সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনার মধুর স্বরে বলেন, আমার জন্য ভেব না মা। আমি তোমাকে না বলে বা তোমার অনুমতি না নিয়ে কোন কিছু করবো না।

শচীদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পুত্রের মুখপানে চেয়ে থাকেন।

* দশম পল্লব *

এইবার একটু মরা ইতিহাসের কথা বলব। সেটা সুলতানী আমল। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল বাঙলার সুলতানী আমলে। বাঙলায় তখন রাজত্ব করছেন পাঠান সুলতানরা। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ তখন বাঙলার সুলতান।

এই হুসেন শাহ্ ছিলেন তদানীন্তন হিন্দু কায়স্থ রাজা সুবুদ্ধি রায়ের কর্মচারী এবং হিন্দু সুবুদ্ধি রায়ের গৃহেই তিনি প্রতিপালিত। তুর্কী মুসলমানের ঘরে জন্ম হলেও হিন্দু গৃহে প্রতিপালিত হুসেন শাহ্ হিন্দুর উদারতা এবং অন্যান্য অনেক সদগুণের অধিকারী হয়েছিলেন।

হুসেন শাহের রাজত্বকাল বাঙলার এক গৌরবময় অধ্যায়।

হুসেন শাহ্ বাঙলার জনগণ নির্বাচিত সুলতান।

হাবসীদের অত্যাচারে ও নির্যাতনে দেশ তখন অরাজক ও বিপর্যস্ত। হাবসীদের অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য দেশবাসী হিন্দু মুসলমান একত্র হয়ে তরুণ কর্মী ও জনপ্রিয় হুসেন শাহ্‌কে সুলতান নির্বাচিত করেন।

হুসেন শাহ্ সিংহাসনে বসে দেশে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

বাঙলা হিন্দু বাঙালীর দেশ। তাদের প্রীতি ও সাহায্য ব্যতিরেকে এদেশে রাজত্ব করা চলে না এই পরম সত্যটি হুসেন শাহ্ মনে প্রাণে অনুভব করেছিলেন এবং উচ্চবংশের হিন্দু রাজাদের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা করে তিনি রাজ্য চালিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি কোন কাজ করতেন না। উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীরাই ছিলেন রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ। যেমন দবির খাস ও সাকর মল্লিক। তাঁরাই শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় পরবর্তীকালে রূপ সনাতন নামে অভিহিত হন।

এবং মহাপ্রভুর ষড়্‌ গোস্বামীর অন্যতম বলে পরিগণিত হন।

গৌড় যদিও তখন বাঙলার রাজধানী তত্রাপি নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রাম তখন বাঙলার সমৃদ্ধ নগর। ধনে, মানে, যশে, ব্যবসাবাণিজ্যে বাঙলার হৃদয়কেন্দ্র। রাজধানী গৌড়ে হলেও নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রামে দুজন শাসনকর্তা ছিলেন। তাদের অভিধা ছিল শহর কোতোয়াল। তাঁরা সুলতানের অধীন।

চাঁদ কাজী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই চাঁদ কাজী ইতিহাসে কুখ্যাত। তাঁর চরিত্র কলঙ্কিত। অত্যন্ত হিন্দুদ্বেষী এবং অতিরিক্ত হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী এই চাঁদ কাজী। সঙ্গীনের খোঁচায় হিন্দুকে মুসলমান করতেন তিনি।

এই গোঁড়া মুসলমান চাঁদ কাজীর কর্ণগোচর হল নবদ্বীপে হিন্দু-ধর্মের এই নব অভ্যুত্থান ও নব জাগরণের সংবাদ।

সংবাদটা অবিশ্যি রঙ চঙ মেখে একটা বিচিত্র রূপ নিয়েই এল। মুসলমান ধর্ম গেল। হিন্দু মুসলমান সকলে একসঙ্গে হরিণাম করছে ও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলছে। রাত্রে বাড়ীতে বাড়ীতে সংকীর্তন হচ্ছে। খোলা করতাল বাজছে। ধেই-ধেই করে লোকে পাগল হয়ে নাচছে।

কাজী বিস্মিত বা স্তম্ভিত হলেন না। কারণ ইতিপূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের মহিমা ও ভক্ত যবন হরিদাসের কাহিনী শ্রবণ করেছিলেন। প্রথমে তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, যাকগে, ও নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রথমে গুপ্তচর এল। পরে কাজির অনুরক্ত মুসলমানরা এলেন। পরে দলে দলে বিপক্ষ দলের হিন্দুরা এসে কাজিকে উত্যক্ত করে তুলল। হিন্দুরা রীতিমত নালিশ জানাল: তাদের ধর্ম গেল।

গৌরাঙ্গদেব এক নতুন মতবাদ প্রচার করছেন, যা বেদ ও শাস্ত্র বহির্ভূত।

কাজীর টনক নড়ল হিন্দুদের অভিযোগে। হিন্দুরা পর্যন্ত যখন অনুযোগ করে তখন রাজকর্ম বিধায় তাঁকে কিছু করতে হয়। তবুও কিছু করবার পূর্বে একবার চাক্ষুষ পরিদর্শন করতে চান। নিজে প্রত্যক্ষদর্শী হতে চান।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি সাঙ্গ-পাঙ্গ ও প্রহরী নিয়ে নগর পরিক্রমণে বেরুলেন। বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন নগরের অবস্থা দেখে। উৎসব মুখর আলোকিত নগরী। প্রতি বাড়ীতে আনন্দধ্বনি। মৃদঙ্গ করতাল ও হরিধ্বনি। কোথাও সংকীর্তনে নৃত্য হচ্ছে। সর্বত্র সারা শহর জুড়ে আনন্দ উৎসব। কাকে মানা করবে কাজী ? কে তার মানা শুনবে ? সকলে যেন মত্ত হয়ে আছে।

কাজীর সাঙ্গ-পাঙ্গরা অশান্ত হয়ে ওঠে। ঘনঘন হরিধ্বনি শুনে তারা ক্ষেপে ওঠে।

লোকের বাড়ীতে অতর্কিতে প্রবেশ করে, কীর্তনের আসরে গিয়ে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিল। লোকজনকে মারধোর করল। জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরে তচনচ করে দিল।

লোকজন ভয়ে কীর্তন বন্ধ করে বাড়ীতে দোর দিল। মেয়েরা ঘর ছেড়ে পালাল।

ত্রাসের সঞ্চার হল নগরে। নাগরিকরা সভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে এল পথে।

অনোন্যাপায় হয়ে কাজী নিষেধাজ্ঞা জারি করল, এ চলবে না। চলবে না এমনি কোলাহল, কলরব ও উৎপাত করে নগরের শান্তি-ভঙ্গ করা। ধর্মের ওপর আমি হাত দিতে চাই না। তবে উৎপাত করে অশান্তি উপদ্রব করতে দেব না।

কাজী নগর-রক্ষক। তার আদেশ রাজাজ্ঞা। রাজাজ্ঞা অমান্য

করবে কে ?

আনন্দোন্মত্ত ভক্ত-নাগরিকদের শিবে বজ্র পতন হল।

কাজীর আদেশে কীর্তন বন্ধ করতে হল। কিংবা গোপনে বন্ধদ্বার কক্ষে নিঃশব্দে হরিনাম করতে হল।

ভক্তেরা ভয়ে ভয়ে দিন যাপন কবেন। তাদেব আনন্দস্রোতে পাথরের বাঁধ দিয়েছে কাজী।

অনেকে দেশ ছেড়ে অন্যত্র যাবার ব্যবস্থা করল। এমন কোথাও যেখানে তারা অবাধে কীর্তন করতে পারবে।

শেষে সকলে দলবদ্ধ হয়ে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হল।

সকলে অনুযোগ কবল, প্রভু, আমরা এখানে কীর্তন করতে পাই না। আমাদেব বিদায় দিন। আমরা এখানের বসবাস উঠিয়ে অন্যত্র যাই।

প্রভু অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। মুহূর্তে তার রূপ বদলে গেল। সুন্দর মুখের কমনীয়তা লুপ্ত হল।

আনন্দঘন শ্যাম নয়নানন্দ কোমলতা বজ্র-কঠোর ও রুদ্র হয়ে উঠল।

—ইস্! কাজী কীর্তন বন্ধ করবে? শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন? তার আগে আমাকে বন্ধ করতে হবে। আমি কাজীর দর্প চূর্ণ করবো। আজ আমি নগর পথে কীর্তন করবো। আজ আমি প্রেমবন্যায় নবদ্বীপ ভাসিয়ে দেব।

ইতিমধ্যে তীর্থপর্যটন শেষ করে নিত্যানন্দ এসেছেন নবদ্বীপে। নিত্যানন্দকে প্রভু আদেশ করেন, শীঘ্র তুমি নগরে ঘোষণা করে দাও, আজ আমি নগরের রাজপথে কীর্তন করবো। কাজীর সাধ্য থাকে বন্ধ করুক। দেখি, কাজী কত শক্তি ধরে।

শ্রীগৌরাঙ্গের এই রুদ্রমূর্তি ও কঠোর আদেশ বাণী শুনে ত্রাসিত নাগরিক দল আশ্বস্ত হল। তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান তার সম্যক পরিচয় পেল।

সকলে উল্লাসে ও উৎসাহে প্রভুর আদেশ ঘোষণা করতে ছুটল।
অগ্নিশিখার মত নবদ্বীপের সর্বত্র প্রভুর আদেশ ঘোষিত হল:
আজ মহাপ্রভু নগর-সংকীর্তনে নগর পথে নৃত্য করবেন। যার কীর্তন দেখবার সাধ হয় সে যেন একটি মশাল হাতে নিয়ে বিকেলে প্রভুর বাড়ীতে যায়।

সারা নবদ্বীপ ফুলে উঠল এই সংবাদে। জনগণ এ-বাড়ী ও-বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। কে কি করবে, কখন এবং কোথায় গিয়ে তারা কীর্তন দেখবে তারই পরামর্শ চলল। একটা নতুনতরো উত্তেজনার আস্বাদে সকলে অধীর হয়ে উঠল। একটা নতুনতরো ঝড় উঠে নবদ্বীপকে আলোড়িত ও উতরোল করে তুলল।
—আজ কী কাণ্ড হয় দেখ। সকলের মুখভাবে এমনি একটা উদ্দাম কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা।
সকলেই ব্যস্ত এবং উদ্‌গ্রীব অধীর।

মহোৎসবের মহা আয়োজনে সকলেই চঞ্চল ও অধীর।
—কা'র অভ্যর্থনার জন্য এই ব্যস্ততা? সকলের মুখে, এই একটি মাত্র জিজ্ঞাসা। বাঙলার সুলতান এমন কি স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহ্ এলেও যে এত আয়োজন করা হয় না। মহাপ্রভু কোন পথে কীর্তন করবেন কেউ জানে না, তবুও যাদের সদর রাস্তার উপর বাড়ী তারা বাড়ীগুলোকে মাঙ্গলিক রূপসজ্জা দিয়ে সাজাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।
দোরে দোরে কদলী বৃক্ষ ও মঙ্গল-ঘট স্থাপন করল। গৃহচূড়ায় বিবিধ বর্ণের পতাকা উড়িয়ে দিল। আম্র পল্লব ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত করল। অনেক বাড়ীতে শানাই বসাল। সন্ধ্যায় দীপ সজ্জার ব্যবস্থা করে রাখল।

শুধু বাইরে নয়, ভিতরেও এমনি ব্যস্ততা। অন্তঃপুরিকারা খই, কড়ি, পুষ্পদল এবং বাতাসা সংগ্রহ করে রাখল। সঙ্কীর্তনে ছড়াবার জন্য। তারপর নিজেরা সাজসজ্জা করতে বসলেন। ছেলে-মেয়েদেরও সাজসজ্জা করে দিলেন ভালো বসন ভূষণে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সেদিনের নবদ্বীপের বর্ণনা করেছেন :

> "কান্দিব সহিত কলা সকল দুয়ারে।
> পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥
> ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
> দুর্বা ধান্য দিব্য বাটির উপর॥"

বেলা অবসান প্রায়।

সন্ধ্যার পূর্বেই উৎসবময়ী নগরী সুবেশা ও সালঙ্কারা রাজরানীর মত হেসে উঠল।

নাগরিকরা পথে বেরিয়েছে মশাল হাতে নিয়ে। সকলে চলেছে মহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে।

মহাপ্রভুর বাড়ীর সামনে জনসমুদ্র! বাইবে বহিরাগতের ভিড়। সকলের হাতে এক বা একাধিক মশাল। ভিতরে প্রভুর আপনজন ও ভক্ত-পার্ষদের ভিড়। যাঁরা কীর্তনে যোগদান করবেন তাদের গলায় ফুলের মালা। সর্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত। ললাটে ও নাসিকায় তিলক।

সমবেত জনতা মাঝে মাঝে হরিধ্বনি করে দিক প্রকম্পিত করে তোলে। সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি নবদ্বীপ কাঁপিয়ে শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। নবদ্বীপ হয়ে ওঠে ঝড়ের সমুদ্র। বিক্ষুব্ধ। তরঙ্গ সঙ্কুল। সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জনেব মত অশ্রান্ত হরিধ্বনি ওঠে।

কাণ্ডারী শ্রীগৌবাঙ্গ তখনো গৃহমধ্যে। শ্রীগদাধর তাঁর বেশবাস করছেন।

গদাধর তাঁর মুখচন্দ্রে অলকা-তিলকা অঙ্কিত করলেন। নয়নে অঞ্জন রেখা আঁকলেন। তার পর চাঁকর-চিকুর কেশবিন্যাস করলেন। মাথায় চূড়া বাঁধলেন। চূড়ায় মালতীর মালা জড়ালেন। কণ্ঠে ঝুলিয়ে দিলেন একগাছি লম্বা মালতীর মালা। মালা তাঁর চরণ-প্রান্ত স্পর্শ করল।

পরিধান করলেন গরদের ধুতি। গলায় দিলেন গরদের উত্তরীয়। তারপর তাঁব নবনী কোমল শ্রীঅঙ্গ চন্দন-চর্চিত করে চরণ কমলে পরিয়ে দিলেন নূপুব। আর প্রতি অঙ্গে দিলেন এক একখানি ভূষণ।

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।"

মহাপ্রভু ভুবনমোহন বেশ ধারণ করলেন। সে রূপের ছটায় সকলের চোখ ধেঁধে গেল। শচী দেখলেন। দেখলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। দেখে দেখার সাধ মেটে না। একজোড়া নয়নে এত রূপ দেখা চলে না।

"নয়ন না তিরপিত ভেল।"

ঘরখানা বিদ্যুৎ-চকিত হয়ে উঠল তাঁর রূপের প্রভায়।

নরহরি গদাধর প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তের দল সম্মতি দিলে, প্রভু ধীরপায়ে বাইরে এলেন।

বাইরে তখন মুহুর্মুহু হরিধ্বনি হচ্ছে কলরব উঠল : প্রভু আসছেন ; প্রভু আসছেন।

তুমুল হরিধ্বনি হল।

প্রভুর নটবর নাগর রূপ দেখে সকলে বিমোহিত হল। পলকহীন নয়নে চেয়ে দেখল সেই নররূপী নারায়ণকে।

প্রসন্ন বদনে যেন নারায়ণ চলেছেন জগতের দুঃখভার হরণ করতে।

বহির্বাটির অঙ্গনে দাঁড়িয়ে তিনি মধুর হাস্যে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

"তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।"

সকলে হরিধ্বনি করে আর মাঝে মাঝে হুঙ্কার করেন প্রভু শচীব নন্দন।

"হুঙ্কার শুনিয়া সবে হইল বিহ্বল।
হরি হরি বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল॥"

তুমুল হরিধ্বনির মধ্যে সকলে মশাল জ্বালাল। অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠে চাবিদিক আলোকিত হল। উদ্ভাসিত হল দিক্‌মণ্ডল।

যত লোক তত মশাল। অনেকের হাতে একটাবও বেশী। অসংখ্য দীপমালার আলোয় দীপালীব শোভা ধারণ করল।

সে এক অভাবিত দৃশ্য। তিমিরান্ধকারাচ্ছন্ন জগদ্বাসীকে আত্মীক আলোক বিতরণ করলেন।

উদ্ভাসিত আলোকচ্ছটায় আরেকবাব সকলে তাবা মহাপ্রভুব মদন-মোহন রূপ অবলোকন কবল। সে এক অপূর্ব দবশন।

উচ্ছ্বসিত উত্তাল দীপতরঙ্গের মধ্যে মহাপ্রভুব সে এক বিস্ময়কব আবির্ভাব। তাঁর শরীবেব প্রতিটি লোমকূপ থেকে বিন্দুর আকারে আলোকচ্ছটা নির্গত হচ্ছে। তাব আলোক মণ্ডিত শ্রীঅঙ্গ ঘিরে একটা অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎচমক।

সেদিকে চাওযা যায় না।

মহাপ্রভুর আদেশে কীর্তনীয়াদের চারিটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে। এক একটি দলের নেতৃত্ব করবেন এক একজন প্রিয় ভক্ত।

প্রথম দলের নেতা আচার্য অদ্বৈত। দ্বিতীয় দলের শ্রীহরিদাস। তৃতীয় দলের শ্রীবাস পণ্ডিত এবং চতুর্থ দলের নেতৃত্ব করবেন স্বয়ং মহাপ্রভু। এই দলে থাকবেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও গদাধর।

মহাপ্রভুর দক্ষিণে থাকবেন নিতাই এবং বামে গদাধর।

যাত্রাকালে এই চারিটি দল নিয়ে যাত্রারম্ভ হল। কিন্তু পথিমধ্যে শত সহস্র দল এসে জুটল। তারা কে, কোথা হতে এলেন কেউ জানেন না।

পথ লোকে লোকারণ্য। যেন মথিত সমুদ্র।

আসন্ন সন্ধ্যায় দীপমালা শোভিত নগরপথে জনসমুদ্র মথিত কণ্ঠে সহস্র কণ্ঠে হরিধ্বনি দিল। একসঙ্গে শত শত মৃদঙ্গ করতাল বেজে উঠল।

মহাপ্রভুর আদেশে অদ্বৈতের দল কীর্তনারম্ভ করে নগরের পথে যাত্রা করলেন। পরে হরিদাস ও শ্রীবাসের দল।

সর্বশেষে মহাপ্রভু স্বয়ং নিজের দল নিয়ে শুভযাত্রা করলেন।

পথের ধারের অট্টালিকা ও গৃহচূড়া, অলিন্দ উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে মেয়েরা খই, কড়ি, বাতাসা ও পুষ্প বর্ষণ করলেন। ভিতরে থেকে তারা হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করলেন।

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হল। বায়ুস্তরে ভাসতে ভাসতে সে মঙ্গলধ্বনি নবদ্বীপ ব্যাপ্ত করে দূর দূরান্তরে চলে গেল। জগতের সব অমঙ্গল দূর হল।

খই কড়ি ও পুষ্পাস্তৃত পথে, জনসমুদ্র মথিত করে মহাপ্রভু চলেছেন

নাচতে নাচতে।

> "লক্ষ লক্ষ লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে।
> চতুর্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
> কোটি কোটি লোক চতুর্দিকে হরি বলে॥"

কোটি কণ্ঠের এই মিলিত মঙ্গল ধ্বনি শুনে নবদ্বীপ ও শহরতলীর সমস্ত লোক ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে এসেছে। মহাপ্রভুর নগর সঙ্কীর্তন চাক্ষুষ করতে।

নগরপথে আজ তাঁর কীর্তন ও নৃত্য দেখে সকলে ধন্য হল।

নগরপথে নৃত্যরত মহাপ্রভুর এই আবির্ভাবকে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রূপদান করেছেন:

> "জ্যোতির্ময় কনক বিগ্রহ দেব সার।
> চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
> চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
> মধুর-মধুর হাসে যিনি সর্ব কলা॥
> ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে।
> বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্র বদনে॥

বহু পুরোনো পদাবলী ও রচনা হয়েছে সেই দৃশ্য অবলম্বন করে।

> "সোনার গৌরাঙ্গ নাচে
> নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর
> ভাগীরথী তীরে তীরে॥
> মহা হরিধ্বনি, চতুর্দিকে শুনি,
> মাঝে শোভে দ্বিজরাজে।
> সোনার কমল করে টলমল
> প্রেম সরোবর মাঝে॥"

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ আজ দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েছেন। অভিনব বেশে হরিনাম কীর্তন করতে করতে চলেছেন রাষ্ট্রের নগর শাসক দুর্ধর্ষ কাজীকে জয় করতে। তাকে সাহসে আহ্বান করতে। সশস্ত্র সসৈন্য শক্তিধর পাঠানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে চলেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ খোল করতাল ও হরিনাম সম্বল করে। দুঃসাহস বইকি! অনেকের কাছে অদ্ভুত বইকি! অনেকে হাসাহাসি করে। কৌতুক করে। আবার অনেকে, যারা জগাই-মাধাই উদ্ধার দেখেছে তারা রুদ্ধশ্বাসে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে শেষ দেখবার জন্য। শ্রীগৌরাঙ্গের বিপক্ষ দল বলে, এইবার নিমাই পণ্ডিত ফাঁদে পা দিয়েছে। এইবার তার নাচন-কোঁদন শেষ হবে। জানেন না তো কার সঙ্গে লাগতে গেছেন। এ চাঁদ কাজী। নবদ্বীপের ভাগ্যবিধাতা। বড় কঠিন লোক। এইবার নিমাই পণ্ডিত জব্দ হবে।

এমনি যারা মুখে বলে বা সংশয় দোলায় দোলে তারা কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মুখভাব এবং ভাবাবেশ দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

কী কাণ্ড হবে ভেবে যারা চিন্তায় আকুল। যাঁর জন্য তাদের চিন্তা, তাঁর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। মুখে চিন্তার রেখাটি পর্যন্ত নেই। অনুদ্বিগ্ন শ্রীমুখে উল্লাস ফেটে পড়ছে। পরমানন্দে ভাবের আবেগে দুই বাহু তুলে নৃত্য করে চলেছেন। উচ্ছ্বসিত আবেগময় কণ্ঠে কীর্তন করছেন। পাশাপাশি দুজনে নৃত্য করছেন। প্রভু ও নিত্যানন্দ। নৃত্য বোধ হয় সংক্রামক। তাঁদের দেখে আর সকলেও তাঁদের ভঙ্গি অনুকরণ করে নৃত্য করছেন।

কিন্তু সে ভাবাবেশ পাবে কোথায়?

প্রভুর নৃত্য যে অপার্থিব। অলৌকিক।

গঙ্গায় নিজের ঘাটে এবং মাধাই-এর ঘাটে কিছুক্ষণ কীর্তন করে শোভাযাত্রা কাজী-পাড়ার পথ ধরল।

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ শোভাযাত্রার পুরোভাগে নৃত্য করতে করতে চললেন।

সেদিন কাজী নগর পরিদর্শনে বের হয় নি। সন্ধ্যা থেকেই বাড়ীতে ছিলেন।
খবর পেয়েছিলেন যে নিমাই পণ্ডিত নগর সংকীর্তনে বেরিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে তাঁর গৃহে তাকে আক্রমণ করতে আসবেন এ খবর জানতেন না।
সকলেই তখন আনন্দে আত্মহারা। আনন্দোন্মত্ত।
অনেকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত।
ভক্তেরা তখন সখী। তারা ভগবানের সঙ্গে রাসলীলা করছেন।
এ যেন নবদ্বীপ নয়। শ্রীবৃন্দাবন।
এমনি নব অনুরাগে ও নব ভাবাবেশে যখন সকলেই অভিভূত। সংকীর্তনের শোভাযাত্রা তখন কাজীর বাড়ীর দিকে চলল।

শোভাযাত্রা কাজীপাড়ায় প্রবেশ করতেই এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ প্রেমোন্মত্ত ভাবালু মানুষগুলো মদোন্মত্ত ও উদ্ধত হয়ে উঠল। সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, "কাজী মার কাজী মার।" সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করল।
কাজীর বাড়ী গিয়ে কাজীকে প্রহার করতে হবে। প্রয়োজন বোধে তাকে বিধ্বস্ত করতে হবে। এই মনোভাব নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জনতা এলোমেলো হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আরেক দল কীর্তনের ধুয়ো তুলে চীৎকার করছে : "ভজ বিশ্বম্ভরে নহে করিব সংহার।" সঙ্গে সঙ্গে হাতের ভাঙ্গা বৃক্ষশাখা নিয়ে আস্ফালন করছে।

কেউ বা শ্রীগৌরাঙ্গের পদতলে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

কাজী লোকের পর লোক পাঠাচ্ছেন কিন্তু যে বা যারা যাচ্ছে, সে বা তারা আর ফিরে আসছে না।

সশস্ত্র সৈন্যেব দল হাতেব অস্ত্র ফেলে দিয়ে কীর্তনের দলে ভিড়ে গিয়ে তাদেব সঙ্গে নাচছে। কেউ বা অগণিত জনস্রোতে ভেসে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

কাব সাধ্য সেই জনসমুদ্রেব ঝাঁপ দেয়। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

দাড়ি-ওলা চাচাব দল ভয়ে ও লজ্জায় অন্ধকাবে মুখ লুকোয়।

মাতামাতি হুড়োহুড়ি করতে লাগল।

কেউ ছুটে গিয়ে একটা গাছেব ডাল ভেঙ্গে নিয়ে আস্ফালন করতে লাগল। কেউ ভাঙা পাঁচিল থেকে থান ইঁট খসিয়ে জড় করল।

বাড়ীর প্রান্তের এই উন্মত্ত কোলাহল কলবর কাজীর কানে পৌছল।

কাজী লোক পাঠালেন: দেখ তো কিসেব গোলমাল? দূর থেকে তাব নজরে পড়ল শত শত প্রজ্বলিত মশাল।

—কিসেব জলুস? বিয়ের না ভূতের ছুঁচোর কীর্তন?

অগণিত জনস্রোত কাজীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলল।

থেকে থেকে সেই উন্মত্ত চীৎকার: কাজী মার! কাজী মার!

কাজীর বুক কেঁপে ওঠে।

আচম্বিতে একদল লোক কাজীর বহিবাটিতে প্রবেশ করে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার আরম্ভ করল। কেউ গাছপালা উপড়ে ভেঙ্গে তচনচ করে দিল। কেউ বন্ধ দরজায় লাথি মারতে লাগল।

দরজা জানালা ভাঙ্গল।

কাজী প্রাণভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে লুকিয়ে রইলেন।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনা উদ্ধৃত করলাম:

"কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥

আম্র পনসের ডাল কেহ ভাঙ্গি ফেলে।
কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি হরি হরি বলে ॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া ॥”

কাজী অন্তঃপুরে থরহরি কাঁপছেন।
বাইরে তখন হিন্দু মুসলমান কীর্তনীয়া ও সাধারণে সব মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। কে অপরাধী, কে নির্দোষ বোঝবার উপায় নেই।
বাইরে প্রলয়ের হুঙ্কার আর তাণ্ডব চলেছে।
শোনা যায় শুধু অবিশ্রান্ত হরিধ্বনি ও আনন্দ চীৎকার।
চীৎকারে কাজীর হৃদ্‌পিণ্ড কেঁপে ওঠে। কর্ণ বধির হয়ে আসে।
কাজী যে সমস্ত লোকের উপর অহেতুক অনাচার ও অত্যাচার করেছিল, তারাই আজ সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে এই অনর্থ ঘটাল ও কাজীর অপচয় করল।
নিমেষে সকলে শান্ত হয়ে গেল। কোলাহল কলরব থেমে গেল। তাণ্ডব বন্ধ হল।
শ্রীগৌরাঙ্গ এসে কাজীর বাড়ীতে প্রবেশ করেছেন।
সকলে নিঃশব্দে তাঁর চরণমূলে প্রণত হলেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাঁর করুণার্দ্র মুখের পানে তাকাল।
মুহূর্তে আগুন নিভে গেল। চারিদিক শান্ত ও নিস্তব্ধ হলো।
কাজীকে অনুপস্থিত দেখে প্রভু প্রশ্ন করেন, কাজী কোথায়?
কাজী ভয়ে অন্তঃপুরে লুকিয়ে আছেন শুনে প্রভু লজ্জিত হন এবং লোক পাঠান কাজীকে ডাকতে।
কিছুক্ষণ পরে অপরাধীর মত বিষণ্ণ বদনে কাজি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেন।
প্রভু আসন গ্রহণ করে কাজীকে বসতে অনুমতি দেন। মৃদু হাস্য

করে তাকে সমাদর জানান।

কাজী সহাস্যে চোখ তুলে তার স্মিত মুখপানে তাকান। সে মুখের দৈবজ্যোতি কাজীকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করে। সে মুখে অসূয়া বা ক্রোধের চিহ্নমাত্র নাই। করুণায় ঢল ঢল জ্যোতির্ময় লাবণ্য সে মুখে।

বুকে সাহস পেল কাজী।

* দ্বাদশ পল্লব *

—এ কিরকম ভদ্রতা? আপনার বাড়ীতে অতিথি আর আপনি মুখ লুকিয়ে ভেতরে বসে আছেন?

কুটিল কৌতুক করে প্রভু বলেন।

কাজী অপলকে অবিচলিত দৃষ্টি দিয়ে মহাপ্রভুর কমনীয় মুখের পানে চেয়ে দেখেন। কথা বলে দেখার আনন্দ শেষ করতে চান না।

কাজী দু'নয়ন ভরে শ্রীগৌরাঙ্গের দেবদুর্লভ রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ করছেন আর ধীরে ধীরে তিলে তিলে নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করছেন।

সে এক পরমাশ্চর্য অনুভূতি। তিনি অনুভব করছেন তাঁর সামনের ঐ জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ তার হৃদয় ধরে প্রচণ্ড আকর্ষণ করছেন। তার সমস্ত সত্তাকে নাড়া দিচ্ছেন।

কাজী এতোক্ষণ মন্ত্রাচ্ছন্নের মত বাণীহীন নিষ্পলক নয়নে তার পানে চেয়েছিল। এইবার তার কণ্ঠ ভাষা পেল: আমি তোমার কাছে অপরাধী, নিজের অন্যায় বুঝতে পেরে ভয়ে লুকিয়েছিলাম। তা ছাড়া গ্রাম সম্পর্কে আমি তোমার মাতুল। তোমার নানা নীলাম্বর চক্রবর্তী আমার চাচা। সেই ভেবেই তোমার অভ্যর্থনা করতে আসিনি। আমার বাড়ী তোমারই বাড়ী।

শ্রীগৌরাঙ্গ মৃদু মধুর হাস্য করেন।

বলেন, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। সংক্ষেপে উত্তর দিলে সুখী হব।

কাজী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ভেতরে চলুন। সেইখানে বলবেন।

—না। এঁরা আমার আপন জন। এরাও শুনতে চায়।

—বলুন। কাজী করজোড়ে বলে।

প্রভু বলেন, কি অপরাধে তুমি আমার কীর্তন বন্ধ করতে চেয়েছিলে এবং কেনই বা স্বেচ্ছায় সে আদেশ প্রত্যাহার করলে ?

কাজী উত্তর দেয়, সকলে তোমাকে 'গৌরহরি' বলে। অনুমতি কর আমিও তোমায় গৌরহরি বলে ডাকবো। আমি কীর্তন বন্ধ করতে চাইনি। প্রথমতঃ আমার লোকেরা বা অন্যান্য রাজকর্মচারীরা আমাকে উত্যক্ত ও অতিষ্ঠ করে তোলে। তার পর তোমাদের হিঁদুরা এসে নালিশ জানালে আমি কীর্তন বন্ধ না করলে তারা বাদশাহের কাছে যাবে। এবং সেখানে নালিশ করবে। হিঁদুরা একজোট হয়ে আমায় ভয় দেখালে। বললে, নিমাই পণ্ডিত নতুন মত ও নতুন পথের প্রবর্তন করছে। হিন্দুধর্মে যা অচল। হিন্দুরা মনে মনে নিঃশব্দে নাম জপ করে। চীৎকার করে' আর ধেই-ধেই নৃত্য করে সে নাম করলে অপরাধ হয়। তারা বলে, নিমাইয়ের উৎপাতে হিন্দুধর্ম গেল। তাকে দমন করা রাজার কর্তব্য।

হিন্দু প্রজাদের সন্তোষের জন্য তখন বাধ্য হয়ে আমাকে কীর্তন নিরোধ করবার আদেশ জারি করতে হল। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হল, কাজটা ভালো করলুম না। রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম এক বিকটাকায় নররূপী সিংহ আমাকে তাড়া করেছে। তারপর আমি কীর্তন বন্ধ করবার জন্য যাদের আদেশ দিলুম, তারা মুসলমান হয়েও 'হরি-হরি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' বলে কীর্তনের দলে ভিড়ে গেল। অমার বুঝতে বাকি রইল না যে গৌরহরি মানুষ নয়, দেবতা। এ-সব মানুষের কাজ নয়। কীর্তনে বাধা দিতে গিয়ে আমার লোকগুলো কৃষ্ণ-ভক্ত হয়ে ফিরে এল। সকলেই যেন যাদুকরের মায়া-মুগ্ধ। সমস্ত ব্যাপারটা যেন ভোজবাজী। উঠে দাঁড়ায় কাজী। শ্রীগৌরাঙ্গের চোখে চোখ রেখে বিনীত কণ্ঠে বলে, না গৌরহরি, তুমি মানুষ নও। হয় তুমি যাদুকর, নয়তো দেবতা।

—কে তুমি? কে তুমি?

মন্ত্রোচ্চারণ করার মত অস্ফুটস্বরে বার বার প্রশ্ন করে।

শ্রীগৌরাঙ্গ সহসা ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে আবার নিজের পানে চান। যেন ইঙ্গিতে বলেন, আমিই সেই।

কাজী অভিভূতের মত নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেয়: হিন্দুরা বড় ভগবানকে নারায়ণ বলে। তুমিই সেই নারায়ণ।

মহাপ্রভু তখন আনত ভঙ্গিতে কাজীর অঙ্গুলি স্পর্শ করে বলেন, তুমি পাপমুক্ত। তুমি মুখে 'হরি' 'কৃষ্ণ' ও 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করে পাপমুক্ত হয়েছ।

কাজী বিস্ময়াপ্লুত নয়নে মহাপ্রভুর মুখপানে তাকাল। তার নয়নে প্রেমাশ্রু। মুখে সশ্রদ্ধ ভক্তি ও আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মহাপ্রভুর জ্যোতির্ময় শ্রীমুখ পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ তার চরণতলে ভূমিষ্ঠ হবে বলেন, আমাকে কৃপা কর গৌরহরি! তোমার চরণে যাতে আমার ভক্তি হয় সেই আশীর্বাদ কর।

প্রভু তাকে উত্তোলন করে বলেন, তোমার কাছে আমার মিনতি তুমি আর কখনো কীর্তনে বাধা দিও না।

—বাপরে বাপ্!

সভয়ে ও সশব্দে কাজীর কণ্ঠ উচ্চারিত হল।

—আমি তো ছার, আমার বংশ পরম্পরায় আর কেউ কখনো কীর্তনে বাধা দেবে না।

কাজী যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করে বোধ হয় কীর্তনের উদ্দেশে প্রণাম করল। মহাপ্রভু প্রসন্ন ও প্রশান্ত বদনে গাত্রোত্থান করে নৃত্য করতে বাহিরে গেলেন।

কাজীও, হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ বলে কীর্তন করে নাচতে নাচতে প্রভুর অনুসরণ করল।

প্রভু তাকে বিরত করে ফিরিয়ে দিলেন।

উচ্চ রাজকর্মচারী প্রকাশ্য রাজপথে নৃত্য করবে অশোভন ভেবেই প্রভু তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

কাজী গৌরহরিকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে বিশ্বাস করল এবং কাজী ও তার বংশধরেরা গৌরহরির উপাসক ও ভক্ত হয়ে রইলেন।

প্রভু শুধু কাজীর দর্প চূর্ণ করলেন না, দয়াল গৌরহরি তাকে পাপমুক্ত করে বুকে টেনে নিলেন।

সেই তো শ্রীগৌরাঙ্গের মাহাত্ম্য।

ভক্তবৎসল ভগবানের অপার মহিমা।

প্রভু গদাধরকে চুপি চুপি বলেন, আমার শ্রীকৃষ্ণ গোপনে আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, তিনি আসবেন।

সখি! তুমি আমার বেশ-বাস করে দাও। কুঞ্জ সাজাও।

প্রভুর তখন রাধা ভাব। বাহ্যজ্ঞান-বিলুপ্ত মহাপ্রভু তখন শ্রীমতী রাধা। গদাধর তাঁর সখী।

আবার আপন মনে বিড়-বিড় করে বলেন, থাক। কাজ নেই আমার বেশ-বাসে। অঙ্গ সজ্জায়। আমি যে কৃষ্ণের দাসী। কি-বা অলঙ্কার দিবি তুই আমাকে? আমি সর্বক্ষণই কৃষ্ণ চন্দ্রহার পরে আছি। হৃদয়ে আমার শ্যাম-পরশমণি! আমার হাতের ভূষণ শ্যামের পাদপদ্ম সেবা। আর নয়নের ভূষণ তাঁর রূপমাধুরী দর্শন।

প্রভুর হাব-ভাব, চলন-ফেরন সব নারীসুলভ। সর্বাঙ্গে তাঁর শ্রীরাধার আবেশ। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগী তাঁর প্রতীক্ষা-কাতর রাধা। পদশব্দে চমকে ওঠেন। ছায়া দেখে চমকে ওঠেন। উৎকর্ণ হয়ে মুরলীধ্বনির প্রতীক্ষা করেন। বাতাসের শব্দকে তিনি মুরলী ভাবেন।

পাতার মর্মরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পদশব্দ শুনতে পান। কৃষ্ণের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় তিনি উৎকণ্ঠিত। অধীর। তাঁর আগমন-বার্তা তাঁর কানে এসেছে। ‘তিনি আসছেন। তিনি আসছেন।’ তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কুঞ্জ সাজিয়ে বাসক-সজ্জা প্রস্তুত করতে।

লতা-পাতা মঞ্জরী পুষ্প সংগ্রহ করেন। গদাধরকে আদেশ করেন বাসক-সজ্জা সাজাতে।

রাত্রি বিগতপ্রায়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধার আবেশে বাসক-সজ্জা করে নিমীলিত নয়নে বসে আছেন কৃষ্ণের প্রতীক্ষায়।

রাধা শ্রীগৌরাঙ্গ উৎকণ্ঠায় অর্ধমৃত। নয়নজলে গণ্ড প্লাবিত। উহু! হু! বলে কাতরধ্বনি করেন। ‘মলেম-মলেম’ বলে আর্তনাদ করেন। প্রভুর শুধু হাব-ভাব নয় কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বদলে যায়। রাধা কাঁদেন তাঁর মাঝে। শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রত্যাশায় তিনি উন্মুখ। ভক্তেরা ভাবে বিভোর। তাঁরা ওতপ্রোত ভাবে প্রভুর এই ভাবোন্মাদনা নিরীক্ষণ করেন। তন্ময় হয়ে ভাবেন আর আকুল হয়ে কাঁদেন।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধা তাঁদের মাঝে বসে শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। রূপ পরিগ্রহ করে তাদের চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় কবি জয়দেবের সেই গান:

> “পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্
>
> রচয়তি শয়নম্ সচকিত নয়নম্ পশ্যতি তব পন্থানম্।”

প্রতীক্ষা-কাতর রাধার সেই অবিকল ছবি দেখে সকলে ভাবাবেগে উদ্দাম হয়ে ওঠে। শ্রীগৌরাঙ্গ মাঝে মাঝে ‘হা কৃষ্ণ’ বলে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ে কাঁদেন। বুক চাপড়ে বলেন, তোরা আমায় এ লোভ কেন দিলি? বেশ তো সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম।

নরহরি ও গদাধর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। প্রভু আবার গদাধরের গলা জড়িয়ে ধরে বলেন, কই সখি! কৃষ্ণ তো এলেন না?

গদাধর ও নরহরি ভাবের ভাবুক। ইতিমধ্যে তাঁদের মাঝেও প্রভুর

ভাবের রস সঞ্চারিত হল। তারা রাধাকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, তাইত! আসবার কথা ছিল কিন্তু এখনো এলেন না কেন?
গদাধর ও নরহরি শ্রীরাধার সখিভাবে প্রভাবিত হলেন। এবং সখিভাবে রাধাকে (প্রভুকে) প্রবোধ দিলেন। কৃষ্ণ আসবেন বলে আশ্বাস দিলেন।
রাধা-প্রেম পরকীয়া। সেই অনাস্বাদিত প্রেমের রস জীবকে আস্বাদন করাবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের এই রাধাভাব।
এই রাধাপ্রেমের উন্মাদনা ও ব্যাকুলতাই গৌরাঙ্গ-প্রেমের মূলমন্ত্র। ভক্ত ও ভগবানে এই সম্বন্ধের নামই মধুর। এই মধুর রসই বৈষ্ণব ভগবৎ সাধনার শ্রেষ্ঠ রস। গৌরাঙ্গ সাধনার মেরুদণ্ড। ভগবান আমাদের অতি প্রিয়জন। আমাদের প্রণয়ী। এই মধুর ধ্যান ধারণাই মানুষকে ভগবৎচরণে পৌঁছে দেয়। ভগবানে প্রীতি, তাঁর সেবার ঔৎসুক্য ও আকুলতা ভগবদ্ভক্তি। প্রেম ও ভক্তি একচালায় পাশাপাশি বাস করে। প্রেম এলেই ভক্তি আসবে। ভক্তি এলেই প্রেম আসবে।
শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে ভক্তির স্থান অতি উচ্চে। ভক্তিই তাঁর সাধনার মেরুদণ্ড। তাঁর জীবনবেদ। তিনি ভক্তি শিক্ষাই দিয়েছেন নিজের ভক্ত এবং আপমর সাধারণকে।
দুর্লভের আকর্ষণ দুর্লভের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তির নামই পরকীয়া। এই পরকীয়া তত্ত্বই বৈষ্ণব ভগবৎ-সাধনার হৃদ্‌পিণ্ড।
এই পরকীয়া তত্ত্বই ব্রজলীলার নিগূঢ় রস। দুর্লভের জন্য উদগ্র বাসনা ও উন্মাদনা, তার কাছে গোপন আত্মসমর্পণ, তার আনন্দের ও সুখের জন্য সর্ব সমর্পণ। এই হলো পরকীয়া প্রেমের মর্মকথা।
প্রাকৃত জগতে হয়তো এ কবির কল্পনা বা সাহিত্যের রস কিন্তু অপ্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক জগতে এর মধুর রস মর্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে।

এরই ভিত্তির উপর রাধা-কৃষ্ণ লীলা বা রাধা-কৃষ্ণ প্রেম।
এরই ভিত্তির উপর মা যশোদার বাৎসল্য। এরই ভিত্তির উপর ব্রজগোপীর প্রেম সাধনা।
দুর্লভের আকর্ষণ প্রচণ্ড।
পরের সন্তানের প্রতি মা যশোদার অপরিমেয় মমতা ও বাৎসল্য, দুর্লভের জন্য সর্ব সমর্পণ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের এক অখণ্ড অমৃতময় কাব্য।
বিশ্বের বাৎসল্য ঐ গোপনন্দিনীর হৃদয়-মন্দিরে কেন্দ্রীভূত।
বাৎসল্য সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই মা-যশোদা। মাতৃত্বের প্রতিভূ। ভগবান জেনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেন নি।
দেবকী-সুত শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে দুর্লভ। দুর্লভের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় মমতা ও প্রচণ্ড আকর্ষণ অনির্বচনীয় বিস্ময়ে ও পুলকে মনকে অভিভূত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সাধনার এক সুগম পথের সন্ধান দেয়।
শ্রীগৌরাঙ্গ তাই বলেছেন, 'ব্রজলীলা বড় মধুর'।

* ত্রয়োদশ পল্লব *

এতোদিন প্রভু বিশ্বম্ভর নবদ্বীপধামে লীলাবিহার করছিলেন একা। নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। মানুষের খেলার সাথী না হলে যেমন খেলা জমে না, ভগবানের তেমনি লীলাবিহারে লীলা-সঙ্গী না হলে লীলা জমে না। লীলা বিস্তৃত হয না।

অবতার অর্থে শ্রীভগবানেব প্রকাশ। মানবিক প্রকাশ। লোকশিক্ষার জন্য অবতাব-রূপী ভগবানের লৌকিক লীলা।

মানুষ ভগবানেব স্বরূপ। তাঁব প্রতিচ্ছবি। তার অংশবিশেষ। সেই মানুষেব এই মর্তলোককে ভগবান ধর্মমন্দিব গড়তে চান। তাই যুগে যুগে স্বযং ভগবান অবতার-রূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়ে ধবাধামে ধর্মেব সংস্থাপন ও অধর্মেব বিনাশ করেছেন।

দ্বাপবে এসেছেন। ত্রেতায় এসেছেন। এসেছেন কলিতে।

একা আসেন নি। এসেছেন দোসব সঙ্গে নিয়ে। কৃষ্ণের সঙ্গে বলবাম। রামেব সঙ্গে লক্ষ্মণ। সেই দুজনেই রূপ বদলে এলেন কলিতে। পুণ্যপ্রবাহিনী সুরধনী তীরের এই নবদ্বীপে। নিমায়ের কায়া নিয়ে ভগবান এলেন জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে। প্রাণের দোসরকে ডেকে আনলেন বীরভূমের একচাকা গ্রাম থেকে। দুজনেই বাঙলার মাটিতে বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে অবতীর্ণ হলেন। নিমাই ডেকে আনলেন নিতাইকে নবদ্বীপে।

যুগ-যুগান্তের প্রাণের দোসর নিতায়ের কায়া নিয়ে নিমায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। ভগবান যুগলের জ্যোতির্ময় রূপের আলোয় নবদ্বীপ ঝলমল করে উঠল। জ্ঞান, শিক্ষা ও সাধনাব নবদ্বীপ বৈকুণ্ঠের রূপ ধরল। বৈকুণ্ঠেশ্বরের পদপাতে।

নিমায়ের পাশে নিতায়েব আবির্ভাব এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। অলৌকিক

বলা চলে।

নবদ্বীপ আলোড়িত হয়ে উঠল দুজনার মিলিত প্রভাবে।

নিমাই ও নিতাই। দুইটি কায়া নিয়ে, শরীর স্বীকার করে ধর্ম সংস্থাপন করতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন ভগবান যুগল।

ধর্ম কি?

যাতে জগতের স্থিতি, যাতে অভ্যুদয়, যা হতে সর্বজীবের শ্রেয়লাভ হয়, সেই ধর্ম। সেই ধর্মের রক্ষার জন্যই যুগে যুগে বার বার নিজেকে নিজেই প্রকাশিত করেছেন অবতার রূপে।

নিমাই ও নিতাই। প্রেম ও ভক্তির দুটি মহানদী। একই খাতে পাশাপাশি প্রবাহিত। দুজনেই নির্মল। নিস্পৃহ। বিশ্বের কল্যাণে ও জীবের মঙ্গলের জন্য দুজনাই খরস্রোতা ও তরঙ্গসঙ্কুল। নিঃশেষে ধুয়ে মুছে দিতে চায় পৃথিবীর পাপ-তম।

সুন্দর, শুভ্র ও শুচিস্মিত করে তুলতে চায় বিশ্বসংসারকে। ধর্মপ্রাণ করে তুলতে চায় বিশ্বের অধার্মিক ও অজ্ঞান জীবকে। প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গে তাদের অবগাহিত করে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে তুলতে চায়।

নিমাই অচঞ্চল। স্থির। গম্ভীর।

নিতাই সদাচঞ্চল। অস্থির। অনির্বাণ শিখার মত দেদীপ্যমান। বাধাস্ফীত জলোচ্ছ্বাসের মত প্রমত্ত ও অপ্রমেয়।

নিত্যানন্দ দুর্বার দুঃসাহসী। বালকের মত দুরন্ত।

কৃষ্ণানন্দে অপ্রাকৃত এই নিত্যানন্দ রায়। শিশুর মত চাপল্য। বালকের মত মধুর স্বভাব। মুখে অফুরন্ত মিষ্টি হাসি। সকলের সঙ্গে প্রীতি সম্ভাষণ। আনন্দের লীলায়িত ঝর্ণা। আপন আনন্দে আপনি তন্ময়। নিজের মনে হাসে গায়। নৃত্য করে। ভাবানন্দে মাঝে মাঝে হুঙ্কার করে। মূর্ত আনন্দ।

যেখানে পদক্ষেপ করেন সেইখানেই প্রীতি ও পুলকের ঢেউ খেলে যায়।

বর্ষার গঙ্গা। উদ্দাম। উত্তাল। তরঙ্গায়িত। তরঙ্গের বুকে কুমীর ভাসছে।

তুরন্ত তুঃসাহসী নিত্যানন্দ সেই তরঙ্গের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নির্ভীক নিতাই কুমীরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। তরঙ্গের বুকে গা ভাসান দেন। স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটেন নদীর জলে।

তীরে স্নানার্থীরা, হায়! হায়! করে। ভাসমান নিত্যানন্দ তুহাত তুলে হাস্য করেন। আনন্দ-প্রগলভ নিত্যানন্দ মাঝে মাঝে আনন্দের তোড়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।

একাদিক্রমে তিন চারদিন জ্ঞান থেকে না।

প্রভু চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। নিতাই হঠাৎ হাস্যমুখে হুঙ্কার করেন: আমার প্রভু নদের নিমাই গোঁসাই।

প্রভু আশ্বস্ত হয়ে হাস্য করেন।

ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে বসে বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন।

দৈবাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে এসে হাজির। দিগম্বর নিত্যানন্দের সেই বাল্যভাব। অধরে সেই মধুর হাসি। উজ্জ্বল আয়ত নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা।

নিত্যনন্দের দিগম্বর মূর্তি দেখে প্রভু হাস্য করেন। কুটিল কৌতুকের হাসি নয়। প্রাণখোলা আনন্দের হাসি। নিত্যানন্দের দৃষ্টিসুন্দর জ্যোতির্ময় নগ্ন দেহের পানে প্রভু বাণীহীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে অপলকে চেয়ে দেখেন। নির্লাজ নির্বিকার নিত্যানন্দও প্রভুর সঙ্গে হাস্য করেন। প্রভু ত্রস্তে নিজের মস্তকের আচ্ছাদন খুলে তাকে পরিয়ে দেন। নিলাজ নিত্যানন্দ তবুও হাসেন।

প্রভু নিজের হাতে তাঁর অঙ্গে সুগন্ধি লেপন করে দেন। তারপর

তাঁর কণ্ঠে মাল্যদান করেন। তাঁর হাত ধরে নিজের সামনে বসান। উচ্ছ্বসিত আনন্দে প্রভু বলেন, তুমি শুধু নামে নিত্যানন্দ নও। তুমি রূপেও নিত্যানন্দ।

ভক্তমণ্ডলী সমবেত কণ্ঠে নিত্যানন্দের প্রশস্তি করে। প্রভু শোনেন।

"তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত রাম।
আহারে বিহারে, চলনে বলনে তুমি নিত্যানন্দ।
সর্বজনের নয়নানন্দ তুমি নিত্যানন্দ।
তুমি নিত্যানন্দ ছাড়া আর কিছু নও।
তোমাকে বোঝা মানব বুদ্ধির অতীত।"

চৈতন্যের রসে ভাবঘন নিত্যানন্দ সহাস্যে বলেন, "প্রভু মোর নদীয়ার পণ্ডিত নিমাই।"

প্রভু নিতাইকে বলেন, আমাদের সকলের বড় সাধ তুমি আমাদের একখানি কৌপীন দাও।

নিত্যানন্দ কৌপীন এনে দিল।

প্রভু কৌপীনখানি টুকরো টুকরো করে সকলকে এক এক টুকরো দিলেন। আদেশ করলেন, সকলে এই টুকরো নিজ নিজ শিরে বাঁধো। নিত্যানন্দের প্রভাবে বিষ্ণু ভক্তি হয়।

—নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। সে ভিন্ন কৃষ্ণের দ্বিতীয় শক্তি নাই।

নিত্যানন্দই তার সঙ্গী। তার সখা। বসন-ভূষণ। বন্ধু। ভাই। নিত্যানন্দ চরিত্র বেদের অগম্য।

—রসময় কৃষ্ণের মতই এর ব্যবহার। এঁর দর্শনে কৃষ্ণ প্রীতি হয়। কৃষ্ণের প্রতি প্রেম-ভক্তি হয়। প্রভু সকলকে ভক্তি ভরে সেই কৌপীণনও শিরে বাঁধতে আদেশ দিলেন। এবং বাড়ী গিয়ে সেটিকে পুজো করতে বললেন।

প্রভুর আদেশে ভক্তেরা আনত ভঙ্গিতে কৌপীনখণ্ড নিজ নিজ শিরে

স্থাপন করলেন। প্রভু বললেন, এইবার নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ কর। কৃষ্ণভক্তি দৃঢ়তর হবে।

সকলে নিত্যানন্দের চরণ প্রক্ষালন করে পাদোদক গ্রহণ করল।

এক একজন পাঁচ সাত বার পান করল।

বাহ্যশূন্য নিত্যানন্দ হাস্য করেন।

প্রভু পরম কৌতুকে পাদোদক বিতরণ করেন।

পাদোদক পান করে সকলে মত্তের মত উচ্চরবে হরিধ্বনি করে। কেউ বলে, বড় স্বাদু এই পাদোদক। কেউ বলে, জীবন ধন্য হল আজ। কেউ বলে, সকল বন্ধন খণ্ডন হল। কেউ বলে আজ প্রকৃতই কৃষ্ণদাস হলাম।

নিত্যানন্দের পাদোদকের মধুর স্বাদ মুখে লেগে থাকে।

পাদোদকের মাদকশক্তি সকলকে চঞ্চল ও প্রমত্ত করে তোলে।

কেউ হাসে। কেউ কাঁদে। কেউ মাটিতে পড়ে হুঙ্কার করে। কেউ নাচে। কেউ গায়।

সকলে সমবেত কণ্ঠে পরমানন্দে কৃষ্ণ কীর্তন করে। কীর্তনের মঙ্গলধ্বনিতে আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়।

প্রভু সহসা হুঙ্কার করে গাত্রোত্থান করেন। এবং নৃত্যারম্ভ করেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। দুজনে হাত ধরাধরি করে ভক্তগণের মধ্যস্থলে নৃত্য করেন।

উদ্দাম উদ্দণ্ড নৃত্য। বেহুঁস হয়ে সব নৃত্য করে। কে কার গায়ে পড়ে, কে কার হাত ধরে, কোন চেতনা নেই।

তাঁরা তখন অন্য জগতে। অন্য রাজ্যে। সে এক অপরিজ্ঞাত অলৌকিক অমৃতময় রাজ্য। সকলেই ভাবোন্মাদ। ভাবের ঘোরে নৃত্য করে। কেউ কারুর পায়ে মাথা কোটে। কেউ কারুর গলা ধরে হাউ হাউ করে কাঁদে।

কারুকে কারুর সমীহ নেই। ছোট বড়, প্রভু-ভৃত্য সকলে একসঙ্গে

নৃত্য করে। কোন ভেদজ্ঞান নেই।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ দুজনে কোলাকুলি করে নৃত্য করেন।

দুই প্রভুর এই আশ্লেষ নৃত্য এক অপরূপ অবলোকন। এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

শ্রীবাস অঙ্গন হয়ে ওঠে বৈকুণ্ঠ ভবন। নৃত্যরত নিত্যানন্দের পদভারে মেদিনী কম্পিত। সোমরসে মত্ত হয়ে বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রেম সহচর সমাবৃত হয়ে নৃত্য করছেন।

সারাদিন এইভাবে কীর্তন চলে। কীর্তনান্তে প্রভু হঠাৎ উপবেশন করে হাতে তিন তালি দিয়ে বলেন, নিত্যানন্দ স্বরূপের যে ভক্তি শ্রদ্ধা করে সে আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এঁর চরণ-বন্দনা করেন। অতএব সকলে একে প্রীত কর। বিন্দুমাত্র এঁর প্রতি যার দ্বেষ আছে, ভক্ত হলেও সে আমার প্রিয় নয়। এঁর বাতাস যার গায়ে লাগবে কৃষ্ণ তাকে সর্বদা সর্বকালে কৃপা করবেন।

প্রভুর বাক্য শেষ হতেই ভক্তেরা উচ্চরবে জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনি দিল।

* চতুর্দশ পল্লব *

আচম্বিতে একদিন প্রভু হরিদাস ও নিত্যানন্দকে আদেশ দিলেন : তোমরা নবদ্বীপের সর্বত্র আমার এই আজ্ঞা প্রকাশ কর। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে এই ভিক্ষা কর : "বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।"
শুধু এই কথাই বলবে। আর কিছু না।
কী হয় দিনান্তে আমাকে এসে খবর দেবে।
প্রভুর আজ্ঞা শুনে ভক্তমণ্ডলী হাস্য করেন।
কিন্তু হাসলে কি হবে? প্রভুর আজ্ঞা উপেক্ষা বা অমান্য করবার শক্তি বা সাহস তো কারুর নাই।
নিত্যানন্দ ও হরিদাস আজ্ঞা শিরোধার্য করে শুভক্ষণে নগর পরিভ্রমণে পথে বের হলেন। হাসিমুখে। প্রসন্নমনে।

"বল কৃষ্ণ। ভজ কৃষ্ণ। কর কৃষ্ণ শিক্ষা।"

হরিদাস ও নিত্যানন্দ। নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরে, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করেন।

"বল কৃষ্ণ। ভজ কৃষ্ণ। কর কৃষ্ণ শিক্ষা।"

দুজনেরই সন্ন্যাসী বেশ। দুজনেরই দেহে দিব্যজ্যোতি। নতুন ধরনের ভিখিরী দেখে পুরজনেরা ত্রস্তে বেরিয়ে আসে ভিক্ষা দিতে। হরিদাস ও নিত্যানন্দ সে ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "কহ কৃষ্ণ। ভজ কৃষ্ণ। লহ কৃষ্ণ শিক্ষা। এই আমাদের ভিক্ষা।"
এই বলেই তাঁরা চলে যান অন্যত্র। অন্য দ্বারপ্রান্তে।
অনেকে সুখী হয় ভিখারীর মুখে নতুনতরো বাণী শুনে।
নানাজনে নানা কথা বলাবলি করে। একটা নতুনতরো জল্পনার খোরাক পেয়ে সকলে খুশিই হয়।
অনেকে নিতাই ও হরিদাসকে খুশি করবার জন্য বলে, আচ্ছা,

তাই বলবো। তাই করবো। অনেকে মুখ আড়াল করে চুপি চুপি বলে, দুটোই পাগল। অনেকে কুবাক্য বলে। বিশেষ যারা শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনের আসরে আমল পায় নি। অনেকে কুবাক্য বলে ক্ষান্ত হয় না। তেড়ে আসে। বলে, চোরের চর। ছল করে সন্ধান নিতে এসেছে। দেয়ানে ধরিয়ে দেব বলে ভয় দেখায়।

নির্ভয়ে হেসে ওঠে হরিদাস ও নিতাই। তারা প্রভুর আদেশ বলে বলীয়ান। তাদের ভয় কি?

নিত্যানন্দ ও হরিদাসের এ দৈনন্দিন কার্য। নিত্য নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ এমনিভাবে নগরের পথে পথে, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলেন,—

"কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই একমন।"

সারাদিন আতপ্ত আকাশতলে ঘুরে ঘুরে দুজনে সন্ধ্যায় প্রভুর কাছে গিয়ে সংবাদ দেন।

হৃষ্টচিত্তে প্রভু তাদের অভ্যর্থনা করেন।

শ্রম বিনোদনের ব্যবস্থা করে দেন।

এ একটা শ্রীভগবানের অখণ্ড বিলাস। তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান। প্রচার করতে চান। নিজের নামের মহিমায় জীবকে উদ্ধার করতে চান।

নামই তাঁর পূজা। নামের মাঝেই শরণাগতি। নামের মাঝেই সর্ব সমর্পণ। নামই তাঁর পূজার মন্ত্র। নামের মাঝেই অসীম বিভু সীমাবদ্ধ হতে চান। বিশ্বের কল্যাণে। সর্বজীবের কল্যাণে। নামের রথে আরোহণ করেই কৃষ্ণ (ভগবান) পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে চান।

নামই শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করে নামিয়ে আনে। ডাক শুনে ভক্তবৎসল ভগবান স্থির থাকতে পারেন না। নাম তখন মূর্ত হয়ে নামীকে নামিয়ে আনে।

নামে সর্বজনের অখণ্ড অধিকার। নামে প্রেম ভক্তির সঞ্চার হয়। অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়। দুস্তর বিপদ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। নাম উচ্চারণে দেবদর্শনের পুণ্য। গঙ্গাস্নানেব শুচিতা ও পবিত্রতা। তীর্থ পর্যটনের ধর্ম। জীবের পরমার্থ ও পরম সাধনা। নামে দুশ্চর তপস্যার ফল। জীবের মাঝে নামরস সংক্রামিত করাই শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন।

তাব সুযোগ্য প্রতিনিধি নিত্যানন্দ ও হবিদাস সেই চেষ্টাই করেন। সেই ভিক্ষাই করেন:

"ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।"

ওগো পুববাসী! তোমাদের কাছে এই মোদের ভিক্ষা। এই ভিক্ষাই তারা করে সবিনয়ে সর্বজনের কাছে।

"কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণে ভজ ভাই হয়ে একমন।"

কাতর মিনতিসজল কণ্ঠে এই ভিক্ষাই করে নিত্যানন্দ ও হরিদাস দিনের পর দিন। প্রতিদিন। তাদেব একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠায় সকলে চমকে যায়।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত কার্যক্রম জ্ঞাপন করেন প্রভুর কাছে।

একটি বিশেষ দিনের কাহিনী।

সেদিন নগরপরিক্রমার সময় পথিমধ্যে নিতাই ও হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল দুই বিশালকায় মদ্যপের সঙ্গে। সাক্ষাৎ দুটি পাপের অবতার।

দুজনারই নাকি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। অথচ এমন পাপ নেই যা তারা করেনি। মদ্যপায়ী। গো-মাংস পর্যন্ত তারা ভক্ষণ করে। এমন দুষ্কার্য

নেই যা তারা করে না। চুরি। ডাকাতি। রাহাজানি। গৃহদাহ। পরস্ত্রী হরণ কোন কিছুই তাদের বাদ যায় নি। লোকমুখে তাদের গুণগান ও কীর্তিকলাপ শুনে চমকে গেলেন হরিদাস ও নিতাই। উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেও তারা দুরাচারী ও দুর্জন। কুখ্যাত ও নবদ্বীপের আতঙ্ক।

দুজনারই মত্ত অবস্থা। অসংযত। অসম্বৃত বেশবাস। অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত। অথচ দুজনেই সদ্বংশজাত। সম্ভ্রান্ত পিতামাতার সন্তান। পুরুষানুক্রমে নবদ্বীপবাসী।

নিত্যানন্দ তাদের পানে চেয়ে চেয়ে দেখেন। করুণার্দ্র নয়নে। দয়াল প্রভুর করুণা-সাগর উদ্বেল হয়ে ওঠে। নিত্যানন্দ আবিষ্টের মত তাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করেন। পাতকীর ত্রাণ হেতু তাঁর অবতার। ত্রিভুবনে এমন মহাপাতকীর আর কোথায় দেখা পাবেন? নিতাই বার বার করুণ নয়নে মত্তপদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। গোপনে নিজেকে প্রকাশ করেন। লোকে দেখতে পায় না। তাঁকে উপহাস করে। এদের দুজনকে প্রভু যদি কৃপা করেন তবে নিখিলবিশ্ব তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ করবে। এ দুজনার যদি চৈতন্য প্রকাশ করেন তবেই নিত্যানন্দ হয় চৈতন্যের দাস। নিত্যানন্দ ভাবেন: এরা যেভাবে নেশায় মত্ত ও আত্মহারা এমনি আপন-ভোলা হয়ে যদি কৃষ্ণ নামে মত্ত হয়, কৃষ্ণকে নিজেদের প্রভু ভেবে যদি কাঁদতে পারে তাহলে আমার এই দীর্ঘ পর্যটন সার্থক হয়। আজ যারা এদের ছায়া স্পর্শে নিজেদের অশুচি ভাবে এবং গঙ্গাস্নান করে তারাই একদিন এদের দর্শনে নিজেকে পবিত্র ও শুচিস্মিত ভাববে, তবেই হবে আগমন সার্থক। পতিতের ত্রাণের জন্য যিনি অবতার সেই নিত্যানন্দের করুণার অপার মহিমা।

—হরিদাস!—ডাকেন নিত্যানন্দ।

হরিদাস উৎসুক নয়নে মুখ তুলে নিতায়ের পানে তাকান।

—এদের দুর্গতি দেখছো ? ব্রাহ্মণ হয়েও এদের দুর্গতি ও দুর্ব্যবহার দেখ। মরণেও এদের নিস্তার নেই। এদের দেখে তোমার মনে করুণা হয় না হরিদাস ? তোমাকে যখন যবনেরা প্রাণান্ত প্রহার করে তখনো তুমি তাদের শুভকামনা করেছিলে। এদের যদি তুমি মনে মনে শুভকামনা করো, এরা দুজনে উদ্ধার পায়।
হাসেন হরিদাস মনে মনেঃ তোমার মনে যখন এদের উদ্ধারের সঙ্কল্প জেগেছে তখন তো এরা উদ্ধার হয়ে গেছে। তোমার সঙ্কল্প কখনো প্রভুর কাছে অন্যথা হয় না। প্রভু নিজেই বলেন।

প্রভুর প্রভাব দেখবে বিশ্বসংসার এদের উদ্ধার হলে। পুরাণের অজামিল উদ্ধারের মত এদের দুয়ের উদ্ধার বিশ্বে প্রচুর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করবে। ত্রিভুবন চাক্ষুষ করবে প্রভুর এই পাতকী উদ্ধার।
হরিদাস বলেন, মহাশয়, তোমার ইচ্ছাই প্রভুর ইচ্ছা। আমাকে ভাঁড়িয়ে লাভ কি ?
নিত্যানন্দ হাসতে হাসতে হরিদাসকে আলিঙ্গন করেন।
বলেন, চলো। মাতাল দুটোর কাছে গিয়ে বলি আমরা প্রভুর আদেশে ভিক্ষা করতে এসেছি।

"সবারে ভজিতে কৃষ্ণে প্রভুর আদেশ।"

এই কথা শোনাবার জন্য নিতাই ও হরিদাস মদ্যপদের কাছে অগ্রসর হন। ডেকে ডেকে শোনান তাদের প্রভুর আদেশ :

"বল কৃষ্ণ। ভজ কৃষ্ণ। লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা। কৃষ্ণ ধনপ্রাণ।"

আরো বলেন,

"তোমা সভা লাগি কৃষ্ণ অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড়ো অনাচার॥"

দুজনেই ক্রোধারক্ত নয়নে মাথা তুলে তাদের পানে চায়। ভাল

করে তাকিয়ে তাদের সন্ন্যাসীর বেশ দেখে। ধর্‌-ধর্‌ বলে দুজনে একসঙ্গে তর্জন করে।

সভয়ে স্খলিত পায়ে হরিদাস ও নিতাই পলায়ন করে।

দাঁড়াও-দাঁড়াও বলে দুজনে তাদের পেছনে তাড়া করে।

নিতাই ও হরিদাস পথের মাঝে ছুটতে থাকে। পথচারীরা ছুটে আসে: দুজন সন্ন্যাসী আজ সঙ্কটাপন্ন। আগেই তো তোমাদের বলেছিলুম, ওদের কাছে যেয়ো না। তখন তো নিষেধ শুনলে না। এখন বোঝ।

পাষণ্ডীর দল মনে মনে হাসে: বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। ভণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। নারায়ণ ওদের শাস্তিব ব্যবস্থা করেছেন।

সুব্রাহ্মণ যারা, তারা বলে, রক্ষ কৃষ্ণ। রক্ষ কৃষ্ণ।

দুর্জনের সংসর্গ বর্জন করা শ্রেয় ভেবে তারা সে স্থান ত্যাগ করে।

প্রাণভয়ে পলায়িত নিতাই ও হরিদাসেব পেছনে তাড়া করেছে উন্মত্ত মোষের মত শিঙ উঁচিয়ে তর্জন কবতে করতে দুই দস্যু। দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করে তাদের ধরতে যায়। নাগাল পায় না।

—ভালো হল বৈষ্ণব। আজ যদি প্রাণ বাঁচে তবেই রক্ষে।

—আর বল কেন ঠাকুর! তোমার বুদ্ধি নিয়ে এই অপমৃত্যু ঘটল। মাতালকে তুমি কৃষ্ণ উপদেশ দিতে গেলে। তার উচিত শাস্তি হল।

হাসতে হাসতে নিত্যানন্দ দৌড়তে থাকেন। পেছনে সমুদ্র তরঙ্গের মত গর্জন করতে করতে তাড়া করে আসে বিশালকায় দুই দস্যু। অতিকায় স্থূল দেহ। সোজা হয়ে চলতে পারে না, তবুও টলতে টলতে স্খলিত পায়ে তাড়া করে।

পেছন থেকে উচ্চৈঃস্বরে পরিহাস করে বলে: কোথা পালাবে রে ভাই? জগা-মাধায়ের হাত এড়িয়ে যাওয়া এতো সোজা নয়। পেছনে জগা-মাধা রয়েছে চোখ চেয়ে দেখো।

বলা হয় নি এই রত্ন দুটির নাম জগাই-মাধাই। কুখ্যাত হলেও তারা

নিজেদের নাম প্রকাশ করতে গৌরববোধ করে।
নবদ্বীপের সবজনবিদিত নাম। সবজনের বিভীষিকা।
তাদের আস্ফালনে ত্রাসিত হলেন নিতাই ও হরিদাস। রক্ষ কৃষ্ণ। রক্ষ গোবিন্দ।—বলে ডাকতে থাকেন।
হরিদাস বলেন, আর আমি চলতে পারি না। সব জেনেশুনেও আমি চঞ্চলের সঙ্গে এলাম। সেদিন কৃষ্ণ যবনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আজ আবার চঞ্চলের বুদ্ধিতে বুঝিবা প্রাণ হারাই।
নিতাই সহাস্যে উত্তর দেন, আমি চঞ্চল নই। তোমার প্রভু যে বিহ্বল। আত্মহারা। ব্রাহ্মণ হয়ে আজ্ঞা করেন রাজার মত। তার আজ্ঞাতেই তো এ বুলি ঘরে ঘরে বলছি। তার আজ্ঞা পালন না করলে সর্বনাশ হয়। আজ্ঞা পালন করে লোকের কাছে অপমানিত হতে হয়। গালিগালাজ শুনতে হয়। প্রভুর দোষ তো তোমার চোখে পড়ে না। যত দোষের ভাগী আমি। হরিদাস মনে মনে হাসে: প্রভুর দোষ? প্রভু রাজাজ্ঞা দেন? বিশ্বের বিভু যিনি, বিশ্বলোকের অধিশ্বর যিনি, তাঁর আজ্ঞা রাজাজ্ঞা সুনিশ্চিত। ব্রহ্মাদি দেবরাজ যাঁর আদেশ পালন করবার জন্য সশব্যস্ত তাঁর আজ্ঞা সর্বথা অবশ্য পালনীয়। রাজ আজ্ঞার চেয়ে তার আজ্ঞা অবধারিত বিশ্বের কল্যাণে। জগৎহিতায়।
হরিদাস ও নিতাই প্রভুকে নিয়ে কপট কলহ করে।
তাদের বাক-বিতণ্ডা করতে দেখে আবার দুজনে তাদের পেছনে তাড়া করে। দৌড়তে গিয়ে দুজনেই মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। নেশার ঘোরে ধুলো মাটিতে লুটোপুটি খায়। বেহুঁস ও বিকল হয়ে যায় মদের নেশায়। নিতাই ও হরিদাস প্রভুর বাড়ীর দিকে এগিয়ে যান।
অল্পক্ষণ পরেই জগাই মাধাই অদৃশ্য হয়ে যায়। পথের মাঝে তাদের আর দেখা গেল না। স্থির হয়ে দুজনে কোলাকুলি করেন। তারপর

নিঃশব্দ ধীর পায়ে প্রভুর বাড়ীর দিকে তারা এগিয়ে চলেন।
প্রভুর আশ্রয়ে গিয়ে তারা নিরাপদ হতে চায়।
অপরাহ্ণ বেলা। বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্ঠিত প্রভু বসে আছেন তাঁর বৈকুণ্ঠভবন শ্রীবাস অঙ্গনে। সর্বাঙ্গসুন্দর মদনমোহন রূপ। মধুর অধরে মধুর হাসি। পার্ষদদের কৃষ্ণ-তত্ত্ব কথা শোনাচ্ছেন। নিজের গুণগাঁথা নিজে ব্যক্ত করছেন। ভক্তেরা সোৎসুক নয়নে তাঁর পানে চেয়ে শ্রীমুখের বাণী শুনছেন। মর্ত্যলোকের অধিপতি যেন সনকাদিকে উপদেশ দিচ্ছেন। এও একটা শ্রীভগবানের লীলাবিলাস। বেণু বাজানোর মত।
প্রবেশ করেন হরিদাস ও নিত্যানন্দ। ক্লান্ত, শ্রান্ত ঘর্মাক্ত কলেবর। আলুথালু বেশবাস। কারুর বুঝতে বাকি রইল না যে একটা অঘটন ঘটেছে। সকলে উৎসুক জিজ্ঞাসাভরা নয়নে তাদের পানে চায়। প্রভুরও কমল লোচনে অধীর জিজ্ঞাসা। নিত্যানন্দ চপল বালকের মত অধীর উল্লাসে করতালি দিয়ে হাসিতে ফেটে পড়েন। দীর্ঘ বিলম্বিত সশব্দ হাসি। হাসি থামতে চায় না। হাসির তোড়ে ও দমকে তাঁর মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠল। দম বন্ধ হয়ে এল। তবুও হাসি থামে না। প্রবল হাসির দমকে ও শব্দে চকিত হয়ে সকলে তাঁর মুখের পানে চাইল।
নিত্যানন্দের পুলকে পুলকিত হয়ে প্রভু তার মুখপানে তাকালেন আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে। সহসা হাসি থামিয়ে আনন্দরসোচ্ছল কৌতুকী কণ্ঠে নিতাই বলেন, ভারি মজা! আজ ভারি মজা হয়েছে।
নিত্যানন্দের মজার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন একমাত্র প্রভু। আর সকলে নির্বাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন।
—ব্যাপার কি নিতাই?
নিতাই আরেকটা হাসির ঢেউ তুলে বলেন, দু দুটো বামুন মাতালে

আজ—কী নাকাল করেছে! ব্যাপরে বাপ!

হরিদাস এতক্ষণে কথা বলেন: প্রাণ নিয়ে যে ফিরে আসতে পেরেছি সে শুধু প্রভুর কৃপায়। হরিদাস আদ্যোপান্ত বিবৃত করেন দিনের ঘটনা। মাতাল জগাই মাধাইয়ের কাছে নাম বিতরণের চেষ্টা, মদ্যপযুগলের আক্রমণ ও পশ্চাদ্ধাবন। তাঁদের পলায়ন ও পরিত্রাণ। আনুপূর্বিক বিবরণ দেন হরিদাস।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে শোনে।

নিতাই হাস্যমুখে প্রভুকে বলেন: আর কোন কিছু বলিনি। তোমার আদেশ মত শুধু বলেছি:

"ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণের নাম।"

ব্যস্! আর যাবে কোথা? ফোঁস্ করে চক্কর তুলে গর্জে উঠল, ধ্যাৎ! তোর কৃষ্ণের নিকুচি করেছে। "শ্রীবিষ্ণু" বলে কানে আঙুল দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলুম। দুজনে দুটো ক্ষেপা বুনো মোষের মত খেদড়ে দিল আমাদের।

—দে ছুট। দে ছুট! আমরাও যত ছুটি তারাও আমাদের তাড়া করে পেছনে ছোটে।

—পথে ভিড় জমে গেল। ছেলের দল হাততালি দিয়ে আনন্দে নৃত্য করে।

—হৈ-হৈ কাণ্ড! সে এক বিপর্যয় ব্যাপার! যেমন অসুরের মত দেহ, তেমনি আগুনের ভাটার মত জ্বলন্ত চোখ! বাপরে বাপ্!

নিত্যানন্দ হাসে আর হাসে। অফুরন্ত অনর্গল হাসি।

প্রভুরও মধুর অধরে হাসির ঢেউ খেলে যায়।

—ওরা দুজন কে? কী ওদের নাম?

প্রভু প্রশ্ন করেন।

কাছেই ছিলেন গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস। দুজনে এগিয়ে আসেন প্রভুর সামনে। প্রকাশ করেন তাদের কৌলিক পরিচয় ও কু-কর্মের বিশদ

তালিকা।—সৎ ব্রাহ্মণকুলে নবদ্বীপের সজ্জন সমাজে এই দুই ভায়ের জন্ম। এদের নাম জগাই ও মাধাই। ঘোরতর মদ্যপ ও দুরাচার। তস্কর ও লুটেরা। এমন কোন পাতক নেই যা এরা করেনি।

প্রভু বলেন, বুঝেছি। বুঝেছি। এ সেই দুই বেটা। আমার এখানে এলে আমি খণ্ড খণ্ড করে ফেলব।

নিত্যানন্দ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ তুমি 'খণ্ড খণ্ড করো। কিন্তু ওরা থাকতে আমি আর যাচ্ছি না। পাদমেকং ন গচ্ছামি।

নিত্যানন্দ ভ্রূকুটি করে কুটিল বিদ্রূপের কণ্ঠে বলেন, আগে ওদের গোবিন্দ-নাম বলাই তারপর তুমি বড়াই কোরো। ধার্মিক যারা তারা তো নিজে থেকেই কৃষ্ণ নাম বলে। এদের যদি প্রেমভক্তি দিয়ে কৃষ্ণনাম বলাতে পারো, তবেই বুঝবো তোমার পতিতপাবন নামের মহিমা। আমাকে তরিয়ে যত না তোমাব মহিমা এদেব উদ্ধার করে তার চেয়ে তোমাব মহিমা ও প্রভাব অনেক বাড়বে।

মধুর হাস্য করেন প্রভুঃ এরা যেমুহূর্তে তোমার দর্শন পেয়েছে, তখনই এরা উদ্ধার হয়ে গেছে। তুমি যাদের মঙ্গল চিন্তা করছো শ্রীকৃষ্ণ তাদের কুশল করবেন।

—হে পরম দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ! —হে করুনৈক সিন্ধো! তুমি যাদের মঙ্গলের জন্য বিচলিত হয়েছো, তাদের আবার ভাবনা কি? তুমি যখন প্রভুর পতিতপাবন নাম সার্থক করতে চাও এই মহাপাতকী জগাই মাধাইকে উপলক্ষ্য করে, তখন তো এদের উদ্ধার হয়েই গেছে। তোমার বিগলিত করুণার স্রোতধারায় অবগাহন করে এদেব জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। এদের পদধূলি মাথায় ধরে আমিও তো যাত্রা করতে পারি। এঁরা দুই ভাই-ই তো আমার পরম ভরসা। আমরাও যে তোমার শরণাপন্ন প্রভু! হে দীনদয়াল! শরণাগতের প্রতি এইবার কৃপানয়নে চাও।

হরিদাস গেলেন অদ্বৈত প্রভুর কাছে। ব্যক্ত করেন সারাদিনের কাহিনী। অনুযোগ করেন প্রভু পাঠালেন তাকে চিরচঞ্চল নিত্যানন্দের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে বিবৃত করেন নিত্যানন্দের গুণগান। তাঁর চাঞ্চল্যের দীর্ঘ তালিকা :

গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে কুমীর ধরতে যায়।
গোয়ালা বাড়ী থেকে ক্ষীর দই নিয়ে পালায়।
দিগম্বর হয়ে পথে বেড়ায়।
কুমারী মেয়ে দেখে বিয়ে করতে চায়।
দুগ্ধবতী গাভীর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খায়।

আমি সকলের হাতে পায়ে ধরে শান্ত করি।

দুরন্ত নিত্যানন্দ। চঞ্চল নিত্যানন্দ। অস্থির অব্যবস্থিত চিত্ত নিত্যানন্দ।

সেই চঞ্চল নিতায়ের সঙ্গে পথে বেরিয়ে কিভাবে দুটো দুর্ধর্ষ মাতালের হাতে নাকাল হতে হয়েছে তারই ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন হরিদাস। বলেন, তোমার প্রসাদে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে এসেছি।

—কোন ভয় নাই। অটল গাম্ভীর্যে হাস্য করেন অদ্বৈত আচার্য। মাতালের বন্ধু মাতাল। বেশ তো তিন মাতালে এক হয়েছিল। নৈষ্ঠিক তুমি তার মধ্যে গেলে কেন ?

অদ্বৈত বলেন, এই নিত্যানন্দ সকলকে মাতাল করবে। আমি তাকে খুব ভালো চিনি। এই দেখ না দু চার দিনের মধ্যে ঐ মাতাল দুটো বৈষ্ণব গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে যাবে। নিতাই আর নিমায়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচবে।

হরিদাস সম্যক বুঝতে পারে না অদ্বৈতর মনোভাব। এ রাগ না পরিহাস ?

অদ্বৈতর মুখখানা কিন্তু ক্রোধারক্ত হয়ে ওঠে। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে হঠাৎ বলেন, আমি নিমায়ের সমস্ত কৃষ্ণভক্তি শুষে নেব। দেখি ও কেমন করে নাচে গায়। নিমাই আর নিতাই সব একাকার করবে। জাতধর্ম কিছু থাকবে না। এখান থেকে জাতধর্ম নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

অদ্বৈতব ক্রোধ দেখে হরিদাস হাসেন।

হাসবে বৈকি! নিমায়েব ওপর অদ্বৈতর ক্রোধ? সে ক্রোধের কোন অর্থ হয় নাকি ?

পুত্রের ওপর পিতার ক্রোধ বুঝতে পারি, কিন্তু উপাস্য ইষ্টদেবতার ওপর উপাসকের ক্রোধের যে কোন অর্থ হয় না। সে কথা হরিদাস বোঝেন। আর কেউ না জানুক হরিদাস জানে অদ্বৈতকে। বোঝে তাঁর মর্মবাণী। অদ্বৈত ভাব মনের আকাশ। গৌরচন্দ্র অদ্বৈত জীবন। হরিদাস জানে সে কথা।

সারা রাত্রি নবদ্বীপের পথে পথে টহল দিয়ে বেড়ায় এই দুটি ভাই। একত্রে। একসঙ্গে। সর্বত্র তাদের গতিবিধি।

এক সময় দুজনে হাজির হয় গঙ্গার ঘাটে। যে ঘাটে মহাপ্রভু স্নান করেন।

সকলে সশঙ্কিত হয়ে ওঠে। কী ধনী, কী নির্ধন, কী পণ্ডিত, কী মূর্খ আপামর জনসাধারণ সকলেই তাদের ভয় করে। দুষ্টু গরুকে সবাই ডরায়।

সন্ধ্যেবেলা বা রাত্রে কেউ ভয়ে ঘাটে যায় না। যদিবা যায় দশবিশজন দল বেঁধে যায়। রাত্রে প্রভুর বাড়ীর পাশে ঘোরাঘুরি

করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীর্তন শোনে। নিশীথ রাত্রে সারারাত জেগে কীর্তন শোনে। মৃদঙ্গ করতাল বাজে কীর্তনের সঙ্গে। এরা দূরে থেকে তালে তালে নৃত্য করে। সঙ্গে থাকে মদ্যভাণ্ড। মদ খায় আর নৃত্য করে। মদ খেতে খেতে এক সময় নেশায় বিহ্বল ও বেহুঁস হয়ে যায়।

প্রভুকে দেখে জগাই মাধাই বলে, নিমাই-পণ্ডিত সারা মঙ্গলচণ্ডীর পালা গাইবে। গায়েনরা সব ভাল। আমি তাদের দেখতে চাই। যেখানে যা পাবো এনে তাদেব দেব।

'ত্যজ দুর্জন সংসর্গ।' -প্রভু দূরে সরে যান। পথযাত্রিরা অন্যপথে চলে যায়!

—কে রে? কে রে?

পদশব্দ পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে জগাই মাধাই। নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করে ফিরছিলেন। তাঁরই পদশব্দে চকিত হয়ে ওঠে জগাই মাধাই। নেশা টুটে যায়।

—আমি। প্রভুব বাড়ী যাচ্ছি। নিতাই উত্তর দেন।

—কে তুই? কী নাম তোর? জড়িতস্বরে প্রশ্ন করে জগাই-মাধাই।

—আমার নাম অবধূত। নিতাই বলেন।

নিতাই তখন বাল্যভাবে বিভাবিত। প্রগলভ বালকেব মত তাদের সঙ্গে রহস্যালাপ করেন। মনের মাঝে স্থির সঙ্কল্প দুজনকে উদ্ধার করবেন। তাই নির্ভয়ে নিশাকালে এই নির্জনে এসেছেন।

'অবধূত' নাম শুনে হঠাৎ মাধাই ক্ষেপে ওঠে। পাশের শূন্য মদের কলসীটা সজোরে ছোঁড়ে নিতায়ের দিকে। মাধাই-এর নির্ভুল লক্ষ্য সেটা নিতায়ের শিরে লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। ভগ্ন কলসের একটা তীক্ষ্ণধার টুকরো নিতায়ের শিরে বিঁধে যায়। প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষতমুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে দর দর ধারে। নিতাই হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে গৌরগোবিন্দকে স্মরণ করেন।

জগায়ের মনে করুণার আমেজ লাগে নিতায়ের রক্ত দেখে। চেপে ধরে মাধায়ের প্রহারোদ্যত হাতখানা। তিরস্কার করে বিদেশী সন্ন্যাসীকে প্রহার করার জন্য। তাকে শান্ত করে পুনরায় আঘাত করতে নিষেধ করে।

লোকমুখে সংবাদ পেয়ে প্রভু আসেন অকুস্থলে। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। সকলে বিগাঢ়-বিস্ময়ে নিতায়ের পানে চেয়ে দেখেন। নিতায়ের দেহ ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে লাল হয়ে উঠছে আর তিনি জগাই মাধাইয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে হাসছেন। স্বর্গীয় আনন্দজ্যোতিতে শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। ক্রোধ বা সন্তাপের চিহ্নমাত্র নাই সে মুখের কোন প্রান্তে। উত্তেজনা নেই। অধীরতা নেই তার ত্রিসীমানায়। প্রশান্ত প্রসন্ন আননে জ্যোতির্ময়ী হাসি। দীর্ঘায়ত কমল লোচনে বিগলিত করুণা। সাক্ষাৎ আনন্দ ও করুণার মূর্তি। তাঁর স্থৈর্য, ধৈর্য ও প্রসন্নতা দেখে সকলে চমকে গেল। হতবাক হল। নিত্যানন্দের রুধিরাক্ত দেহ প্রভুকে ব্যথিত ও বিচলিত করে তোলে। ক্রোধে বাহ্য বিলুপ্ত হয়। প্রকট হয় সংহার-মূর্তি। চক্র! চক্র! বলে আনমনে তারস্বরে ডাকতে থাকেন।

অন্তরীক্ষ থেকে তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল চক্র এসে উপস্থিত হয়। সভয়ে জগাই-মাধাই প্রত্যক্ষ করে সেই চক্র।

বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রমাদ গনে।

নিত্যানন্দ অস্থির হয়ে ওঠেন। ত্রস্তে এগিয়ে যান প্রভুর কাছে। সবিনয়ে নিবেদন করেন: মাধাই আঘাত করলেও জগাই তাকে বাধা দিয়েছে। তাকে রক্ষা করেছে। বলেন, দৈবাৎ-রক্তপাত হয়েছে। তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। তুমি স্থির হও। ওদের দুজনের জীবন আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও।

জগাই নিত্যানন্দের প্রার্থনা শুনে প্রভুর চরণতলে লুণ্ঠিত হয়। প্রভু প্রসন্ন হয়ে তাকে আলিঙ্গন করেন। আশীর্বাদ করেন, কৃষ্ণ তোমায়

কৃপা করুন। নিত্যানন্দকে রক্ষা করে তুমি আমায় কিনে নিলে। যা তোমার অভীষ্ট তাই তুমি আমার কাছে বর চাও। আজ থেকে তোমার প্রেমভক্তি লাভ হোক। জগাইকে যেমন বর দিলেন প্রভু অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবমণ্ডলী জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনি করলেন। আর জগাই প্রভুর শ্রীমুখে "প্রেম ভক্তি লাভ হোক" বাণী শুনে প্রেমে মূর্ছিত হয়ে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ল।

—ওঠো জগাই। আমার পানে চেয়ে দেখ। সত্যিই আমি তোমায় প্রেমভক্তি দান করলুম।

জগাই মুখ তুলে চোখ খুলে তাকাল। কী দেখল জগাই? ভাগ্যবান জগাই দেখে তার চোখের সামনে মুহূর্তে রূপান্তরিত হলেন প্রভু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তিতে। চারিদিক অনৈসর্গিক অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। চোখ মেলে তাকাতে পারে না জগাই। মাথা তুলতে পারে না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মূর্ছিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ তার বিস্তৃত বিশাল বক্ষতটে শ্রীচরণ স্থাপন করেন। দয়াময়! এতো কৃপার পাত্র তোমার এই জগাই? ধন্য জগাই! তোমার পাতকী জীবনে এত সুকৃতি সঞ্চিত ছিল?

মহাপাতক হয়েও তুমি মহৎকৃপাপাত্র মহাপ্রভুর। হিংসা হয়। তোমার চরম ভাগ্যের এ যে পরম পাওয়া। মা লক্ষ্মীর অর্চিত ব্রহ্মাদি দেবগণের বাঞ্ছিত পাদপদ্ম তুমি বক্ষে ধারণ করতে পেলে। মহাযোগী ও দুশ্চর তপস্বীর কাছে যা দুর্লভ তাই তুমি অদৃষ্টক্রমে অনায়াসে অধিকার করলে।

এ যে অচিন্তিতপূর্ব সৌভাগ্য। অতিদৈব। মাধাই কাঁদছে। প্রেমারুণ রাগে তার ভিতরের জমাট বরফ গলতে শুরু করেছে। চোখ ফেটে হু-হু-চ্ছাসে গড়িয়ে পড়ছে সেই জল। অশ্রুধারায় তার লোমশ বিশাল বিস্তৃত বুক ভেসে যাচ্ছে। দুনয়নে দুটি দীর্ঘ ধারা। গণ্ড প্লাবিত করে পাথরের মত নিরেট বুকে নামছে আর নাচছে দুটি

শীর্ণকায়া নদীর মত।

কাঁদছে আর কাঁদছে মাধাই। নিত্যানন্দ তার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে করুণ নয়নে তার পানে চেয়ে আছেন।

শ্রীরামচন্দ্র অহল্যার পাষাণমূর্তির পানে চেয়ে আছেন।

জগাই আর মাধাই। একে অপরের দ্বিতীয় সত্তা। পাপ, পুণ্য যা কিছু করেছে দুয়ে মিলে একত্রে একসঙ্গে করেছে। স্বাতন্ত্র্য নেই। স্বকীয়তা নেই। দুয়ে এক।

মাধাই আব থাকতে পারে না। নিত্যানন্দেব পাশ কাটিয়ে দৈবাৎ প্রভুর পদপ্রান্তে প্রণত হয়। প্রার্থনা-সজল কণ্ঠে বলে, পাপ একসঙ্গে দুজনে করেছি। পাপের ভার দুজনের সমান। অনুগ্রহ যখন করলে তখন অনুগ্রহকে দুভাগ করো না। আমাকেও অনুগ্রহ করো। আমি তোমার নাম নেব। প্রভু বলেন, তোর নিস্তার নেই। তুই আমার নিত্যানন্দের দেহে রক্তপাত করেছিস।

—অসুবেরা তোমাকে বাণবিদ্ধ কবল। তবু তাদেব তুমি চবণে ঠাঁই দিলে কেন? মাধাই বলে।

—তার চেয়েও তোর বড় অপরাধ। নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করে তুই রক্তপাত করেছিস। নিতায়ের দেহ আমার চেয়ে বড়। এ কথা তুই জেনে রাখ এ পরম সত্য।

প্রভু বলেন।

—তা হলে আমার পরিত্রাণের উপায় বলুন প্রভু কৃপা করে। মাধাই মিনতি করে।

আবার স্তুতি করে, তুমি সর্বরোগ নাশ। বৈদ্য চূড়ামণি। তুমি আমার চিকিৎসা করলে আমি সুস্থ হব। আমার সঙ্গে আর কপটতা করো না। সংসারের নাথ তুমি। সকলে তোমায় চিনে ফেলেছে। লুকোবে কেমন করে?

প্রভু বোধহয় প্রসন্ন হলেন। বললেন,

"অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া গিয়া পড়॥"

প্রভুর আদেশে মাধাই তখন নিতাই চরণে শরণ নিল। রেবতী-সেবিত চরণ সব বিঘ্ন বিনাশ করে।

প্রভু স্মিতহাস্যে নিতাইকে বলেন, ও তোমার অঙ্গে আঘাত করেছে। ও তোমার শরণাগত। তোমার ইচ্ছা হলে ওকে তুমি ক্ষমা করতে পারো।

--আমি কি বলবো প্রভু? নিতাই বলেন। আমার শক্তি তো তুমি। জন্মজন্মান্তরের যদি কোন সুকৃতি আমার থাকে সব আমি মাধাইকে দিলাম। এ কথা নিশ্চিত জেনো। যত অপরাধ সব আমার। ওর কোন দায় নেই।

আবার মিনতি করে বলেন, মায়া ছাড়ো। কৃপা কর তোমার মাধাই।

এর পর আর বলবার কি আছে?

তবু করুণাময় প্রভু নিতাইকে অনুরোধ করেন:

"যদি ক্ষমিলা সকল
মাধায়েরে কোল দেহ হউক সফল।"

প্রভুর আজ্ঞায় নিতাই মাধাইকে দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ করেন।

মাধাইয়ের সর্ব পাপ ও বন্ধন বিমোচন হল। মাধাই-এর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশ করলেন। সর্বশক্তি সমন্বিত হয়ে মাধাই নবজন্ম-লাভ করল। জগাই ও মাধাই। দুজনার উদ্ধারপর্ব সম্পূর্ণ হল। দুজনেরই বন্ধন বিমোচন হল।

প্রভু বলেন: তোরা আর না করিস পাপ।

জগাই মাধাই বলে: আর নারে বাপ॥

দয়াল প্রভু তাদের প্রতিশ্রুতি দেন, আর যদি তোরা পাপ না করিস সত্যি সত্যি আমি তোদের বন্ধন মোচন করবো। তোদের কোটি

কোটি জন্মের সঞ্চিত পাপের সমস্ত দায় আমার। তোদের মুখে আমি আহার করবো। তোদের দেহে হবে আমার প্রকাশ।

প্রভুর শ্রীমুখের আশ্বাসবাণী শুনে আনন্দে জগাই মাধাই সেইখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

প্রভু আজ্ঞা করেন, ওদের দুজনকে আমার বাড়ীতে নিয়ে চল। এদের সঙ্গে আমি কীর্তন করব।

প্রভু যাদের কৃপা করেন তাদের অন্তরের নিভৃতদেশে ঠাঁই দেন।

প্রভু বলেন,

"ব্রহ্মার দুর্লভ পাত্র এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব॥"

প্রভুর প্রাণের দোসর নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা করেছেন, এদের ছায়া মাড়িয়ে যারা গঙ্গাস্নান করে তারাই ভবিষ্যতে এদের গঙ্গার মত পবিত্র ভাববে।

নিত্যানন্দের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করবেন মহাপ্রভু। তাঁর মনের বাসনা অপূর্ণ থাকবে না।

নিত্যানন্দের ইচ্ছাই প্রভুর ইচ্ছা। দুই-ই এক বস্তু। কেবল লীলা অনুরোধে ভিন্ন দেহ। ভিন্ন ভাব।

শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যেমন বলরামের কার্য। শ্রীগৌরের সেবা করা তেমনি নিতায়ের কার্য। নিতাই শ্রীগৌরের অভিন্ন স্বরূপ। কৃষ্ণ-বলরামের মত নিতাই-গৌরের কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণব ভক্তেরা সাদরে জগাই মাধাইকে নিয়ে গেলেন প্রভুর বাড়ীতে।

আত্মীয় পরিজন ও পরিকরগণ প্রভুকে সাদর সম্ভাষণ জানান।

প্রভুর আদেশে দ্বার অর্গলবদ্ধ করা হয়। প্রভু বিশ্বম্ভর আসন

গ্রহণ করেন। একপাশে প্রভু নিত্যানন্দ ও আরেক পাশে গদাধর বসেন।

সামনের আসন অলঙ্কৃত করেন আচার্যরত্ন শ্রীঅদ্বৈত। চারিদিকে বসেন বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও প্রভু হরিদাস। রামাই, শ্রীবাস গঙ্গাদাস আচার্য চন্দ্রশেখর প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এলেন একে একে।

সকলে জগাই মাধাইকে নিয়ে আনন্দে মত্ত হন। সকলে প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে ওঠেন। সকলের শরীরে রোমহর্ষ, মহাঅশ্রু ও কম্প। জগাই মাধাই ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দেয়। শ্রীচৈতন্যের অপার মহিমায় দুজন দস্যু মহাভাগবতে পরিণত হল। পরম পাষণ্ড রাতারাতি তপস্বী সন্ন্যাসী বনে গেল।

জগাই মাধাই দুজনে গৌরসুন্দরের স্তুতি করে। প্রশস্তি করে। অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য সে স্তুতি। বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল তার ভাষা ও ভাব। স্বয়ং বাগ্‌দেবী তাদের জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হলেন। দুজনে সমবেত কণ্ঠে এইমত স্তুতি করে :

"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর ধর॥
জয় জয় নিজ নাম বিনোদ আচার্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্বকার্য॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য শরণ॥
জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু॥
জয় রাজপণ্ডিত দুহিতা প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর॥

সেই জয় জয় তুমি কর যত কাজ।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত বর॥
জয় জয় অদ্বৈত জীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্র বদন নিত্যানন্দ॥
জয় গদাধর-প্রাণ মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস বাসুদেব প্রিয়কর॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত তাহা ঘোষয়ে সংসারে॥
আমা দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব মহিমা তোমার॥
অজামিল উদ্ধারের যতেক মহত্ব।
আমার উদ্ধারে তাহা পাইল অল্পত্ব॥"

জগাই মাধাই অঝোরে কাঁদে আর স্তুতিগান করে। তাদের আকুতি দেখে বৈষ্ণবেরা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন,

"যে স্তুতি করিল প্রভু এ দুই মগুপে।
তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কোন বাপে॥
তোমার অচিন্ত্যশক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যে রূপে কৃপা করহ যাহারে॥

প্রভু বলেন, এরা দুজনে আর মগুপ নয়। এরা আমার সেবক। সকলে এদের দুজনকে অনুগ্রহ করবে। কারুর প্রতি যদি এদের কোন অপরাধ থাকে এদের ক্ষমা করে এদের প্রতি প্রসন্ন হও। প্রভুর নির্দেশ শুনে জগাই মাধাই একে একে সকলের চরণ স্পর্শ করে প্রণত হল। সকলে তাদের সর্বান্তকরণে আশীর্বাদ করলেন প্রসন্নমুখে।

জগাই মাধাই নিরপরাধ সাব্যস্ত হল।

—ওঠো। ওঠো জগাই মাধাই। তোমরা আমার অনুগত দাস হলে। আর কোন চিন্তা নাই।

—এ সবই নিত্যানন্দের প্রসাদে জেনো।

—তোমাদের যত পাপ সব আমি শুষে নিয়েছি। আমার দিকে তাকালেই অনুভব করতে পারবে। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কাঁচা সোনার বর্ণ কৃষ্ণাভ হয়ে গেছে।

—এদের দুজনের সব পাতক আমি নিজের শরীরে নিয়েছি। প্রভু বলেন, সকলে বিস্ময়াবিষ্টের মত প্রভুর পানে চেয়ে দেখে।

সামনে অদ্বৈত। প্রভু তাকে প্রশ্ন করেন, আমাকে কেমন দেখছো ? অদ্বৈত উত্তর দেন, যেন শ্রীগোকুলানন্দ।

অদ্বৈতর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে প্রভু বিশ্বম্ভর হাস্য করেন। সমাগত ভাগবতগণ হরিধ্বনি করেন।

প্রভু বলেন, এদের পাতকে আমায় কালো দেখছো। কীর্তন করো। সব মুছে যাবে।

উল্লসিত হন ভাগবতগণ।

কীর্তন আরম্ভ হয়।

প্রভু বিশ্বম্ভর নিতানন্দের সঙ্গে নৃত্য করেন। অদ্বৈত নাচেন। যিনি এই অবতারের আদি কারণ।

সকলে একসঙ্গে করতালি দিয়ে কীর্তন করেন। সকলে ভাবোন্মাদে নিঃসঙ্কোচে নৃত্য করেন। মহানন্দের কোন সঙ্কোচ নেই। সমীহ নেই।

নাচতে নাচতে প্রভুর সঙ্গে ঠেলাঠেলি হয়। তার জন্য কারুর কুণ্ঠা নেই। দ্বিধা নেই।

বধূকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে বসে শচীমাতা এই আনন্দোৎসব দেখেন। তাঁর হৃদয়ের আনন্দ-সাগর উদ্বেল ও উত্তাল হয়ে ওঠে।

সকলের মাঝেই মহানন্দের প্রকাশ। সকলের মাঝেই কৃষ্ণাবেশের প্রখর উল্লাস। যাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে রমা কুণ্ঠিত হন তিনি মণ্ডপের অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে নাচছেন। রাতারাতি দুই দস্যুকে মহাভাগবতে পরিণত করে গৌরহরি তাদের সঙ্গে নাচছেন।

এ এক অদৃষ্টপূর্ব অভিনব দৃশ্য বই কি! নৃত্যাবেশে প্রভু উপবেশন করেন। অনুচরেরা তাঁকে ঘিরে বসেন।

সকলের দেহ ধূলি ধূসরিত। সকলেই ক্লান্ত। প্রভু ভাগবতদের আহ্বান করে বলেন, চলো। গঙ্গাস্নানে যাই। প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে স্নিগ্ধ ভাগিরথী জলে অবগাহন করে শ্রান্তি দূর করতে চলেন। সে-ও এক অনির্বচনীয় অভূতপূর্ব আনন্দোৎসব।

কীর্তন রসে তখন প্রায় সকলেই শিশুর মত চঞ্চলচিত্ত ও অস্থির। মহাভব্য বৃদ্ধ পর্যন্ত শিশুর মত চঞ্চল ও প্রগলভ। জলের মাঝে সকলে মাতামাতি করে।

অদ্বৈত, নিতাই ও গৌরাঙ্গ তিনজনে একসঙ্গে জলকেলি করেন। শ্রীবাস, হরিদাস ও মুকুন্দ একসঙ্গে খেলা করে। নিতাই দুর্দান্ত। অদ্বৈতর নয়নে জলের ঝাপটা দেয়। বুড়ো অদ্বৈত চোখ মেলে তাকাতে পারেন না। নিতাইকে গলাগালি দেন: কোথা থেকে মাতাল এসে মাতালদের উদ্ধার করল। শ্রীবাসকে কটাক্ষ করে বলেন, শ্রীবাসটার আসলে জাত নেই। নইলে কোথাকার এক অবধূতকে সংসারে ঠাঁই দেয়। প্রভুকেও ইঙ্গিত করতে ছাড়েন না। বল্লেন,

> "শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম করে।
> নিরবধি অবধুত সংহতি কি রয়ে॥"

অদ্বৈত ও নিতায়ের যত বিবাদ তত পিরীতি। দৈবাৎ তাদের কপট কলহ শেষ হয়। দুজনে গৌরাঙ্গ রসে বিভোর হয়ে জলের মধ্যেই কোলাকুলি করেন।

নিতাই মহানন্দে গঙ্গার জলে ভেসে বেড়ায়।

কীর্তনের শেষে এই জলকেলি প্রভুর প্রাত্যহিক বিলাস।

এ লীলা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্তরীক্ষ থেকে অলক্ষ্যে দেবতরা এ লীলা প্রত্যক্ষ করেন।

স্নানশেষে জল থেকে উঠে সকলে উচ্চ হরিধ্বনি করে। প্রভু সকলকে মালাচন্দন ও প্রসাদ বিতরণ করে বিদায় দেন।

সকলে ভোজন করতে যান।

জগাই মাধাইকে প্রভু সভাস্থলে সমর্পণ করেন। নিজের গলার মালা দেন দুজনার গলায়।

গৃহে প্রত্যাগমন করে প্রভু পদপ্রক্ষালন করে তুলসীর চরণ বন্দনা করেন। অতঃপর প্রভু ভোজনে বসেন।

সেও এক আনন্দোৎসব। ভাগবত পরিবেষ্টিত প্রভুর এই ভোজনপর্ব। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি ভোজন করেন দেবগণ সঙ্গে।

শচীদেবী নৈবেদ্যান্ন পরিবেশন করেন, অন্তরালবর্তিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দূর থেকে দেখেন।

পুত্রের পাশে শচীদেবী জগন্মাতার রূপ ধারণ করেন।

জগাই মাধাই উদ্ধার হলো। শুধু উদ্ধার হলো না দস্যু রত্নাকর, রাতারাতি বাল্মীকি বনে গেল। তাদের পরিবর্তন দেখে নদেবাসীরা চমকে গেল। নিত্যানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল ও সার্থক হল।

পুণ্যশ্লোক ও পুণ্যচরিত বলে পরিগণিত হল জগাই মাধাই।

তাদের নবজন্ম হল। জীবনের ধারা বদলে গেল। সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সবিশেষ কৃপালাভ করে তারা জগতে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রইল।

শ্রীনিত্যানন্দের অশেষ অনুগ্রহে তাদের নিত্যধামের পথ সুগম ও আলোকিত হল।

উষাকালে দুজনে গঙ্গাস্নানে যায়। দিনে দুই লক্ষ নামজপ করে। পূর্বকৃত দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করে রোদন ও অনুতাপ করে। মাঝে মাঝে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

সর্বক্ষণ মুখে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণরসে মত্ত মন উদার ও সদাচারী হয়ে উঠল। নিত্যানন্দের কৃপাগুণে তারা নতুন মানুষ হল। জীবন তাদের মধুর ও পবিত্র হল। জীবনযাত্রার ধারা তাদের নিয়ন্ত্রিত হল। জীবনের পথ উজ্জ্বল ও মধুময় হল।

নিত্যানন্দের শিক্ষায় বৈষ্ণবের পরম ধর্ম ক্ষমা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা অভ্যাস করল। উদার ও অহিংস হল।

তারা নির্মোক খুলে নতুন রূপ পরিগ্রহ করল।

নিতায়ের প্রেমে মাধাই সবক্ষণ আবিষ্ট। নিতাই তার ধ্যান-জ্ঞান-জপমালা। তার সাধন-ভজন। নিত্যানন্দের বাতাস গায়ে লেগে সেও আনন্দময় হয়ে উঠেছে। সংসারকে ভালোবাসতে শিখেছে। দয়া করতে শিখেছে।

দৈবাৎ একদিন নিভৃতে নিত্যানন্দের দর্শন পেয়ে মাধাই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে বিগলিত প্রেমাশ্রুতে তাঁর চরণ ধুয়ে দিল। দন্তে তৃণ ধারণ করে আকুল কণ্ঠে তাঁর স্তব করল :

"বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন॥
শক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্বতী-শঙ্কর॥
তোমার যে ভক্তিযোগ তুমি কর দান।
তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন॥

তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥
তুমি সে অনন্ত মুখে কৃষ্ণগুণ গাও।
সর্ব ধর্ম শ্রেষ্ঠ ভক্তি তুমি সে বুঝাও॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের তুমি সর্বশক্তি॥”

মাধাই নিত্যানন্দ পদাশ্রিত। নিত্যানন্দ-তত্ত্ব অনুধাবন করেছে মাধাই। নিতাইকে বাদ দিয়ে শ্রীগৌরের ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় না। যিনি কৃষ্ণ তিনিই গৌর। যিনি বলরাম তিনিই নিতাই। বলরাম যেমন কৃষ্ণের দ্বিতীয় সত্ত্বা, তেমনি নিতাই গৌরের দ্বিতীয় দেহ বা অভিন্ন স্বরূপ। কৃষ্ণ বলরাম যেমন অভেদ, গৌর নিতাই ও তেমনি অভেদ। অভিন্ন। দুই-ই এক বস্তু শুধু লীলা অনুরোধে ভিন্ন দেহ। ভিন্ন ভাব। কৃষ্ণের সেবা বলরামের কার্য। গৌরের সেবা নিতায়ের কার্য। বলরাম মূল সঙ্কর্ষণ। কৃষ্ণের লীলাসম্পাদনে সহায়তারূপ সেবাকার্য তিনি স্বয়ং করেন। আর সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে কৃষ্ণের আদেশ পালন করেন। আবার তিনি শেষ বা অনন্তরূপে অনন্ত সেবা করেন।

মাধাই অনুতপ্ত।

সে তার দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হতে চায়। পবিত্র হতে চায়। সে নিত্যানন্দকে আরাধনা করে তৃপ্তি পায় না। তার আকুল নিবেদন শেষ হয় না।

সে আবার বলে ঃ

“সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ! তুমি বক্ষে ধর॥
পরম কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার।
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুক্তি করিনু প্রহার॥

মুঞি হেন দারুণ পাতকী নাহি আর ॥
যে অঙ্গ পূজনে সর্ব-বন্ধ বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ শরণ।
হেন অঙ্গ মুঁঞি পাপী করিনু লঙ্ঘন ॥”

মাধাই নিজেকে ঘোরতর পাপী ও দুরাচার জ্ঞানে রোদন করতে থাকে। প্রেমাশ্রুতে তার বুক ভেসে যায়। হঠাৎ ধরাশায়ী হয়ে নিতাইয়ের চরণযুগল নিজের বুকে তুলে নেয়।

মাধায়ের আকুতি ও আকুল স্তব শুনে নিত্যানন্দ হাস্য করেন। প্রসন্ন মুখে, বলেন : ওঠো। ওঠো মাধাই! তুমি আমার অনুগত। তোমার শরীরে আমার প্রকাশ হল।

আশ্বাসের মধুর কণ্ঠে প্রবোধ দেন : শিশুপুত্র পিতাকে আঘাত করলে পিতা কি দুঃখ পায়? তোমার প্রহার আমার কাছে ঠিক সেই মত। আমার কাছে আর তোমার তিলমাত্র অপরাধ নাই।

—যেজন চৈতন্য ভজে সে হয় আমাব প্রাণ। যুগে যুগে তার আমি পরিত্রাণ করি।

পরিতুষ্ট নিত্যানন্দ মাধাইকে আলিঙ্গন কবলেন।

মাধাই সাগ্রহে ও সোৎসুক নয়নে নিতায়ের মুখের পানে তাকায়। তার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অপার কৃতজ্ঞতা ও জিজ্ঞাসা।

মাধাই কিছু করতে চায়। এমন কিছু করতে চায় যাতে তার কলঙ্কিত অতীত তার জীবনেব পৃষ্ঠা থেকে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যায়। যাতে সে সর্বজনের ও সবসাধারণের প্রীতি ও আশীষ কুড়িয়ে পায়। সর্বসাধারণের কাছে অপরাধী সে। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে সে তাদের প্রসন্ন করতে চায়।

মাধাই নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছে। সে তার অতীতের মসীময়

ও কলঙ্কিত পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলতে চায়। কোন মহৎ কর্মের সদানুষ্ঠান করে সে মহৎ হতে চায়।

নিত্যানন্দ বোঝেন তার মনোভাব। বলেন, এক কাজ করো মাধাই। তুমি অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবাকার্য কর। গঙ্গার স্নানের ঘাট সংস্কার করে দাও। সবসাধারণে সুখে স্নান করতে পেলে সকলে তোমার কল্যাণ কামনা করবে। তোমার জয় ঘোষণা করবে। তোমার পূর্ব অপরাধ ভুলে যাবে ও ক্ষমা করবে।

নিত্যানন্দকে বহুবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে মাধাই গঙ্গার ঘাট নির্মাণ কার্যে ব্রতী হল। ঘাটে দাঁড়িয়ে সর্বসাধারণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে যত অপরাধ করেছি তার জন্য ক্ষমা কর। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমাকে ভালোবাসো।

দুর্বিনীত-ভয়াল মাধাই-এর এই আকস্মিক দীনভাবে সকলে অবাক হয়ে যায়। তার মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। নয়নে প্রেমাশ্রু। সকলের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করে।

পরদিন সকলে সবিস্ময়ে দেখে মাধাই স্বয়ং কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে মজুরদের সঙ্গে ঘাটে কাজ করছে।

গঙ্গার নতুন ঘাট নির্মিত হল। নাম হল মাধাই-এর ঘাট।

নবদ্বীপের মাধাই-এর ঘাট আজো কৌতূহলী নবদ্বীপ-যাত্রীর চোখের সামনে সেই পুণ্যময় বিস্তৃত অতীতকে তুলে ধরে স্মরণাতীত কালের সেই গরিমাময় গৌরাঙ্গযুগকে স্মরণে এনে দেয়।

বারে বারে, যুগে যুগে শ্রীভগবান গোলক ছেড়ে মর্তে নেমে এসেছেন, মানবের এই দয়াহীন সংসারে। বারংবার বলে গেছেন : তোমরা ক্ষমা কর। ভালোবাসো। অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।

নবদ্বীপের গৌরাঙ্গলীলার মাধাই-এর ঘাট ও নবদ্বীপের পথঘাটে

ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত প্রতিটি ইঁট পাথর মানবজাতিকে সেই পরম শিক্ষাই দেয়।

"ক্ষমা করো সবে ভালোবাসো।
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।"

গৌর-নিতাই সেই প্রেমমন্ত্রই বিতরণ করে গেছেন। মর্তের জীবনকে। হরিনামের মধ্যে নিহিত আছে প্রেম ও ভক্তির সেই বীজমন্ত্র।

মাধাই-এর ঘাট তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর। যে নাম নিতাই ও হরিদাস প্রথম দিন জগাই মাধাই ও নবদ্বীপের ঘরে ঘরে প্রচার করতে চেয়েছিলেন সেই নামই আজো উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে মাধাই-ঘাটের প্রতিটি ইঁট পাথর চুন ও বালুকণা।

"ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।"

স্নানের ঘাট হলেও মাধাই-এর ঘাট মন্দিরের মত পবিত্র ও শিক্ষাপীঠ। বাইরে মাধাই। ওর অন্তরে নিতাই। নিতাই ওর পঞ্জরাস্থি।

* পঞ্চদশ পল্লব *

নবদ্বীপ গৌরাঙ্গদেবের কৃপায় হয়ে ওঠে শ্রীবৃন্দাবন।
উৎসব-মুখর নগর। বারো মাসে তেরো পার্বণ।
ব্রজভূমে শ্রীকৃষ্ণের যতগুলি উৎসব ও পালপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়, একে একে শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছায় সবই অনুষ্ঠিত হল শ্রীধাম নবদ্বীপে। ঝুলন। জন্মাষ্টমী। নন্দোৎসব এবং শ্রীমতি রাধার জন্মোৎসব।
ভক্তেরা সাগ্রহে ও সাড়ম্বরে সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে মত্ত হয়ে ওঠেন।
একদিন শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত পুলিন ভোজন করলেন সুরধুনী তীরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ-সহ।
নবদ্বীপের নতুন নামকরণ হল : গুপ্তবৃন্দাবন।
বাঙলার শিক্ষাকেন্দ্র নবদ্বীপ হল ভারতীয় সাধনার পুণ্যতীর্থ

জনবহুল ঘন বসতি নগর। ফল ফুলের উদ্যান বড় একটা চোখে পড়ে না।
কদাচিৎ দু একটা দেখা যায় সুরধুনী তটে।
একদিন নদীতীরে ভ্রমণকালে একটি পুষ্পিত উদ্যানের শোভা দেখে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন মনে হল। ফলভারে অবনত পত্রোশ্যাম বৃক্ষ সমূহ ও পুষ্পোজ্জ্বল ফুলবন দেখে তাঁর বৃন্দাবন ভ্রম হল।
কলস্বরা সুরধুনীকে যমুনা মনে হল। সেখানকার মনোরম পরিবেশ প্রভুকে রাস-বিহ্বল করে তোলে।
ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে তিনি শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়ে হাজির।
ভক্ত পার্ষদদের কাছে মনোভাব ব্যক্ত করেন : রাসোৎসব করবেন শ্রীবাস অঙ্গনে। আয়োজন করতে বলেন ভক্তদের।

নতুনতরো আনন্দের গন্ধ পেয়ে ভক্তেরা নেচে ওঠে।

আয়োজন পর্ব শেষ হল।

মৃদঙ্গ করতাল এল।

"রাসরঙ্গ গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ ॥"

কিন্তু ভাবনার কথা হলো, তিনি কোথায়? শ্যাম নটবর রাসবিহারী কই?

রাসবিহারীকে বাদ দিয়ে রাস-লীলা কেমন করে হবে? প্রভু তো রাধা। রাধে ভাবে বিভোর। কৃষ্ণ বিরহে সকলে আকুল হয়ে ওঠেন।

রাসবিহারী রাসের গন্ধ পেয়ে রাসমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন।

রাধা-ভাব সম্বরণ করে প্রভু শ্যামরূপ ধারণ করলেন এবং মুরলী বাজাতে লাগলেন। তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ দেখে ও মুরলীর সুর শুনে ভক্তেরা মন্ত্রাচ্ছন্নের মত অবশ ও অভিভূত হলেন।

কিন্তু শ্রীরাধিকা কই? কাকে নিয়ে রাসলীলা করবেন প্রভু? সে এক বিপর্যয় কাণ্ড। দেখতে দেখতে চোখের পলকে গদাধর শ্রীমতী রাধা এবং নরহরি মধুমতীর রূপ পরিগ্রহ করলেন।

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে মুহূর্তে শ্রীবাস অঙ্গন শ্রীবৃন্দাবনের রাসমণ্ডপে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা সখা-সখী এমন কি ধবলী, শ্যামলী প্রভৃতি গাভীরাও সেখানে সমুপস্থিত।

যুগল শ্রীকৃষ্ণ-রাধা মাঝখানে দাঁড়ালেন। সখিরা তাদের ঘিরে হাত ধরাধরি করে রাসনৃত্য করলেন।

ভাগ্যবান ভাগ্যবতী নবদ্বীপবাসীরা শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপায় নবদ্বীপে বসে শ্রীবৃন্দাবনের মধুর রাসলীলা ও যুগলরূপ দেখে নয়ন সার্থক করল।

এমনি ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসী সর্বসাধারণকে ও ভক্তদের ব্রজলীলার সব রস প্রত্যক্ষ ও আস্বাদন করালেন।

নবদ্বীপকে তিনি ভালোবেসেছিলেন এবং নবদ্বীপবাসীর ওপর তাঁর

অপার করুণা। তাই একটি একটি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্রজের সব লীলা মাধুর্যই তাদের চাক্ষুষ করালেন। আকণ্ঠ পান করালেন সেই অমৃত রস।

বাকি রইল শুধু মাথুব বা কৃষ্ণ-বিরহ। নবদ্বীপবাসী ও ভক্তদের প্রত্যক্ষ বিরহ দিয়ে প্রভু উপলব্ধি করাবেন বিরহ বেদনা কী মর্মান্তিক। প্রভুর বিরহ-ব্যথা উপলব্ধি করাবাব দিন প্রত্যাসন্ন।

নবদ্বীপবাসী গৌরাঙ্গভক্তদের বুকে শৈলাঘাতেব দিন আগত।

এইবার তাদের প্রস্তুত হতে হবে।

নবদ্বীপের আনন্দের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

* ষষ্ঠদশ পল্লব *

মহা সমারোহে সঙ্কীর্তন হচ্ছে শ্রীবাস অঙ্গনে।

শত শত ভক্তের শুভাগমন হয়েছে। মহাপ্রভু এসে কীর্তনের আসরে প্রবেশ করলেন।

ভক্তদেব আনন্দ ও উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল প্রভুর আগমনে।

তুমুল হরিধ্বনি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রভু কীর্তনে যোগদান করেন।

প্রভুর কণ্ঠনাদে ও মুহুর্মুহু হুঙ্কারে শ্রীবাস অঙ্গন প্রকম্পিত হল।

নৃত্যের তালে তালে ও নূপুরের রিনি ঝিনি শব্দে বাতাস সঙ্গীত তরল হয়ে ওঠে।

প্রেমানন্দে মত্ত ভক্তগণ আনন্দ বিহ্বল হয়ে পড়েন।

শ্রীবাস পণ্ডিতও দুই বাহু তুলে প্রেমানন্দে নৃত্য করছেন।

প্রাকৃত জগতের সমস্ত চেতনা তাদেব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বহির্জগতের সমস্ত দরজা জানালা তাঁদের কাছে অবরুদ্ধ। সঙ্কীর্তনের সময় তারা এক নতুন জগতে বাস করছেন।

শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন হচ্ছে। শ্রীবাসের আনন্দই যে সবার বেশী। তিনি তখন অন্য জগতের অধিবাসী। ভুলে গেছেন তিনি সংসারী। তাঁর স্ত্রী পুত্র আছে। আত্মীয় পরিজন আছে। এক দেশে যখন দিনের আলো অন্য দেশে তখন অন্ধকার। এই নিয়মেই বিশ্বসংসার চলছে। এও লীলাময়ের লীলা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

শ্রীবাস অঙ্গনেও সেদিন সেই লীলাখেলা চলেছে।

আলোকজ্জল ও আনন্দোজ্জ্বল বহির্বাটিতে যখন আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আর উৎসবের বাঁশী বাজছে ঠিক তেমনি সময়ে অন্তঃপুরের একটি নির্জন কক্ষের স্তিমিত আলোকে এক জননী সাংঘাতিক পীড়িত পুত্রের রোগশয্যার শিয়রে বসে অপলক নেত্রে

স্তব্ধ রাত্রির প্রহর গণনা করছেন। কাতর নয়নে রুদ্ধশ্বাসে মরণোন্মুখ পুত্রের মুখপানে চেয়ে আছেন সংশয়ে আধমরা হয়ে।
ইনি আর কেউ নন শ্রীবাস পত্নী মালিনী। শ্রীবাসের একমাত্র অল্পবয়স্ক পুত্র সাংঘাতিক রোগে পীড়িত। শুশ্রূষারত জননী মালিনী তার শিয়রে বসে আছেন রুদ্ধশ্বাসে, আর শ্রীবাস তখন পরমানন্দে সংকীর্তনে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করছেন। ভিতরের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। কোন চিন্তা নাই।
তিনি চিন্তা করে করবেন কি? কেন অনর্থক চিন্তা করবেন? যিনি তাঁর সর্বময় কর্তা তিনিই তাঁর পুত্রের কথা চিন্তা করবেন। পুত্র যে তাঁরই। যিনি জীবজগতের গতি, তিনি তাঁর আঙিনায় নৃত্য করছেন তার আবার ভাবনা কি?
ভিতর থেকে ডাক আসে শ্রীবাসের। নৃত্যরত শ্রীবাস প্রভুর পানে একবার সশ্রদ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করে ভেতরে চলে যান।
রাত্রি বেড়েছে। প্রহর অতীত হয়েছে।
রুগ্ন পুত্রের শিয়রে দাঁড়িয়ে শ্রীবাসের বুঝতে বাকি রইল না যে পুত্রের অন্তিম আসন্ন।
তিনি মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে পুত্রের মুখপানে চেয়ে দাঁড়ালেন তারপর উদাত্ত কণ্ঠে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন।
মালিনী এবং অন্যান্য নারীরা অস্ফুট ক্রন্দন করে ওঠেন।
শ্রীবাস সবিনয়ে ও সকাতরে তাদের শান্ত হতে বলেন: তোমরা শান্ত হও অযথা প্রভুর আনন্দের বিঘ্ন হয়ো না। যাঁর নাম করলে মহাপাতকীও তরে যায়, তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত। আমার অঙ্গনে নৃত্য করছেন। এ সৌভাগ্য স্বয়ং ব্রহ্মার কাম্য। পুত্র আমার ভাগ্যবান। যদি পুত্রের ওপর তোমাদের প্রকৃত স্নেহমমতা থাকে তবে আনন্দ কর। উৎসব করো। বৃথা ক্রন্দন করো না। ক্রন্দন করে প্রভুর মনের শান্তি ভঙ্গ করো না। উপস্থিত ভক্তদের

মনে দুঃখের ঢেউ তুলো না। পুত্র আমার পুণ্যবান। শুভক্ষণে শুভলগ্নে জন্মেছিল এবং পুণ্যলগ্নে নৃত্যরত শ্রীভগবানের সামনে দেহত্যাগ করেছে। তার জন্য কাঁদবে কেন? আমার তো আনন্দ হচ্ছে। এতেও যদি তোমাদের মন প্রবোধ না মানে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য তোমরা ক্ষান্ত দাও। প্রভুর আনন্দ রস-ভঙ্গ করো না। প্রভুর ধ্যান ভাঙ্গিয়ে আনন্দে ব্যাঘাত ঘটিও না। তাঁর কীর্তনে ব্যাঘাত ঘটলে আজি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবো।

এই কথা শুনে মালিনী এবং পুরনারীরা ক্ষান্ত হলেন এবং ক্রন্দনে বিরতি দিলেন।

শ্রীবাসের পুত্র তখন অমৃতলোকে যাত্রা করেছে।

কিন্তু এ সংবাদ কীর্তনের আঙিনায় পৌঁছিল না বা কেউ জানতে পারল না।

শ্রীবাসের মুখের রেখায় বিষাদের বা শোকের চিহ্নমাত্র নাই। তিনি হর্ষোৎফুল্ল আনন্দে 'হরি বোল', 'হরি বোল' বলতে বলতে দুই বাহু তুলে কীর্তন সভায় গিয়ে যোগদান করলেন এবং নৃত্য করতে লাগলেন।

মৃত্যু সংবাদ আগুনের মত বেশীক্ষণ চাপা থাকে না। এ সংবাদও ক্রমে ক্রমে ভক্তদের কানে পৌঁছিল।

যিনিই এ খবর শোনেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়ে বিস্মিত-আতঙ্কে হতবাক হয়ে শ্রীবাসের মুখপানে চেয়ে দেখেন।

সে মুখে শোকের কুয়াশা পর্যন্ত নাই। পুত্রের সদ্যবিয়োগ ব্যথার চিহ্নমাত্র নাই। প্রসন্ন প্রশান্ত আননে অকাতরে দুই বাহু তুলে পরমানন্দে নৃত্য করছেন। ভক্তেরা স্তম্ভিত হয়ে প্রভুর মুখপানে চেয়ে মনে মনে বলছেন: প্রভু এ তোমারই লীলা। শ্রীবাস তোমার প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ। তাঁর অন্তরে তুমি ছাড়া আর কোন ছায়াটি পর্যন্ত নাই। সেই তুমি তাঁরই অঙ্গনে নৃত্য করতে করতে তাঁর

একমাত্র পুত্রকে হরণ করলে অথচ তাঁর মনে শোকের একটি ঢেউ পর্যন্ত উঠল না। অবিচলিত হৃদয়ে অকম্পিত কণ্ঠে কীর্তন করছেন। এ তোমারই লীলা। মঙ্গলময় তুমি এ-ও তোমার মঙ্গল ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। শ্রীবাস ধন্য! তোমার প্রতি তাঁর ভক্তি লোকশিক্ষায় সমাদৃত হোক। ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার ভক্ত শ্রীবাস। ধন্য শ্রীবাস অঙ্গনের পুণ্যভূমি!

ক্রমে ক্রমে একে একে সকলেই নৃত্যে ক্ষান্ত দেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যও বন্ধ হয়। স্তব্ধতায় ভরে যায় শ্রীবাস অঙ্গন। আকুল নিস্তব্ধতা থম থম করতে থাকে।

মহাপ্রভু সম্বিৎ ফিরে পান।

তিনি অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ভক্তদের মুখের পানে তাকান।

কণ্ঠ উচ্চারিত হয়। প্রশ্ন করেন, আমার অন্তর কাঁদে কেন?

—সে প্রায় চার দণ্ড রাত্রির সময়। দু প্রহর পূর্বে।

প্রভু নির্বাক। নিঃশব্দে পরিপূর্ণ নয়নে অনেকক্ষণ শ্রীবাসের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর কমলায়ত নেত্র যুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এল। দমন করতে পারলেন না উদগত অশ্রু। তিনি রোদন করতে লাগলেন শ্রীবাসের মুখপানে চেয়ে। তারপর ধীরে ধীরে সাশ্রুনয়নে পুলক কম্পিত কণ্ঠে বলেন, ধন্য! ধন্য তুমি শ্রীবাস। তুমি আজ শ্রীকৃষ্ণকে কিনে রাখলে।

প্রভু হঠাৎ বিচলিত হয়ে ওঠেন। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তিনি বাষ্পাচ্ছন্ন অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, কিন্তু আমি এই সঙ্গ ত্যাগ করে যাবো কেমন করে? তোমাদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে ভেবে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

মহাপ্রভু অধোবদনে অঝোরে রোদন করেন। তোমার অন্তঃপুরে

কি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে শ্রীবাস? কীর্তনে সুখ পাচ্ছি না। আনন্দ পাচ্ছি না। কেন?

শ্রীবাস দৃঢ়স্বরে উত্তর দেন, প্রভু তুমি আমার বাড়ীতে উপস্থিত। এ সময় আমার বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা অসম্ভব।

প্রভু সংশয় বিচলিত। উৎকণ্ঠিত। ভক্তদের প্রশ্ন করেন, তোমরা শীঘ্র বল পণ্ডিতের বাড়ীতে কি কোন বিপদ হয়েছে?

ভক্তেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। কোন উত্তর দিতে পারে না। দুঃখের কথা প্রভুকে কেউ ব্যক্ত করতে চায় না।

শেষে অব্যক্ত ব্যক্ত হল।

ভক্তেরা বলেন, শ্রীবাসের পুত্র দেহত্যাগ করেছে।

—সেকি? কখন?

প্রশ্ন করেন প্রভু।

ভক্তেরা তাঁর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝল কিনা কে জানে, তবে শ্রীবাস তাঁকে মুক্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা দিলেন: প্রভু পুত্রশোক সইতে পারি। সে শক্তি তুমিই আমাকে দিয়েছো। কিন্তু তোমার চোখের জল আমি দেখতে পারি না। তুমি শান্ত হও। রোদন সংবরণ করো।

প্রভু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রোদন সংবরণ করে শ্রীহস্তের উল্টো পিঠে চোখ মুছলেন।

প্রভু কিছুটা শান্ত হলে, শ্রীবাসের পুত্রের মৃতদেহ বাইরে এনে আঙিনায় শোয়ানো হল। প্রভু তার শিয়রে উপবেশন করে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন।

প্রভুর প্রশ্ন বালকের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হল। প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে তার নীরব কণ্ঠে ভাষা পেল।

এই অলৌকিক ব্যাপারে সকলে স্তম্ভিত হল। যে যেখানে ছিল ছুটে এলো। শ্রীবাসের শোকাকুল পরিজনেরা আঙিনায় বেরিয়ে এলেন। ভক্তেরা সত্যমৃত বালককে ঘিরে দাঁড়ালেন। বালক

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলল, আমার এ জগতের কাজ শেষ হয়েছে তাই আমি অন্য জগতে যাচ্ছি। প্রভু কৃপা করো যেন তোমার চরণে মতি থাকে।

বালক আবার চোখ মুদে নীরব হল। তার আত্মা এতক্ষণে দেহ ছেড়ে চলে গেল।

মৃত বালকের জননী মালিনী দেবী এতক্ষণে বুঝলেন, যে পুত্র তাঁহার মরে নাই। সম্পূর্ণ জীবিত। তাহার জন্য শোক করবার কারণ নেই বা বিধেয় নয়। মালিনী শোক ভুলে গেলেন। তাঁর মুখ আবার আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল। শ্রীবাসের ভাই ও আত্মীয় পরিজন প্রভুর চরণে সর্বসমর্পণ করল তারা, গৌরাঙ্গ-দাস হল।

প্রভু শ্রীবাসকে সান্ত্বনা দেন: যখন সংসারে এসেছি তখন সংসারের বিধি-নিয়ম মেনে চলতে হবে। কেউ কেউ সংসারে শুধু অশান্তি ও ক্লেশ। তুমি তার অনেক উঁচুতে। তুমি আমার আপন-জন। তোমাকে একটি সান্ত্বনা দিই। তুমি পুত্র হারিয়েও পুত্রহীন নও। আমি ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার পুত্র।

শ্রীবাসের সৌভাগ্যকে অভিনন্দন জানিয়ে সকলে তুমুল হরিধ্বনি দিল।

* সপ্তদশ পল্লব *

এইবার নবদ্বীপে মাথুর বা কৃষ্ণ-বিরহ পালা শুরু হল।

প্রভুর শ্রীমুখ বিষাদ মলিন। উদ্বেগ-কাতর। তিনি নতুনতরো ভাবাবেশে মগ্ন। কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপী-ভাব।

অক্রুর এসে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেছেন আর কুব্জা তাঁকে ভুলিয়ে রেখেছে।

"কেমন গোঙাইব দিবস রাতি।"

শ্রীরাধা বা গোপীভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন :

"কেমনে গোঙাইব দিবস রাতি।"

অন্ধকার দেখে চমকে ওঠেন রাত্রি আসন্ন ভেবে। জ্যোৎস্না দেখে হাহুতাশ করেন ; এই দীর্ঘ জ্যোৎস্নাবিধুর রজনী কাটবে কেমন করে কৃষ্ণ বিনা।

এমনি ভাবের ঘোরে কখনো অচেতন ও মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তাঁর বিরহ বেদনা দেখে সকলের বুক ফেটে যায়।

আবার চেতনা ফিরে পান। ভক্তদের মুখপানে চেয়ে প্রশ্ন করেন, কে আমি ? আমি নিমাই না রাধা।

কেউ কোন উত্তর দেয় না। আবার একসময় বিরহ-বেদনা সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়ে যান।

প্রভুর এমনি গোপী-ভাব উদয় হলে, তিনি আর শ্রীভগবানরূপে সর্বসমক্ষে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করেন না।

প্রভুর অন্তরের বেদনা বুঝতে বাকি থাকে না। প্রভুর বিশুষ্ক মলিন মুখ, তাঁর কাতর রোদন ভক্তদের আকুল করে তোলে। অথচ তাঁকে

সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পান না।

প্রভুর মনে দৃঢ়মূল ধারণা জন্মেছে যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেছেন। এবং গোপীদেব সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। অনুরক্ত গোপীদের মর্মন্তুদ বিরহ ব্যথা দিয়ে তিনি অন্যায় করেছেন। তাদের বুক ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাদের চোখের জল সার করেছেন। অবলা সরলা গোপীদের মুগ্ধ কবে এভাবে পবিত্যাগ করা অত্যন্ত অকরুণ মনে হয় মহাপ্রভুর।

কৃষ্ণের উপর তাঁর অভিমান হয় এবং অভিমান দুর্জয় ক্রোধে পরিণত হয়। কৃষ্ণকে তাঁব নির্মম ও হৃদয়হীন মনে হয়।

গোপীদের প্রতি এই নির্মমতা তাঁর অশোভন ও অনাচার মনে হয়।

তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মনে মনে সঙ্কল্প করেন তিনি আর কৃষ্ণকে ভজন কববেন না। গোপীদের ভজন করবেন।

যে মহাপ্রভু প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ জপ করতেন, সেই প্রভু অকস্মাৎ কৃষ্ণনাম ছেড়ে গো-পী-গোপী জপ করতে থাকেন। ভক্তেরা নির্বাক বিস্ময়ে প্রভুর বেদনা-বিধুর মুখের পানে চেয়ে দেখেন।

সেদিন পিঁড়িতে বসে এমনি একাগ্র মনে প্রভু গোপী-নাম জপ করছেন। এমন সময় প্রভুর পবিচিত বাল্যের সতীর্থ ও সহপাঠী কৃষ্ণানন্দ আলমবাগীশ সেখানে উপস্থিত হলেন।

আলমবাগীশ প্রখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রর আচার্য ও অধ্যাপক। তখন দেশজোড়া তাঁর খ্যাতি।

বাল্য সুহৃদ নিমাই পণ্ডিতকে তিনি দেখতে এসেছেন। তাঁর সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অনেক কিছু শুনেছেন। শুনেছেন তিনি নবদ্বীপকে আলোড়িত করে তুলেছেন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি হরিভক্ত হয়েছেন।

পূর্বের নিমাইকে চেনা যায় না। তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আলমবাগীশের মনে হয় প্রভু অপরূপ সুন্দর হয়েছে। তাঁর জ্যোতির্ময় দেহের অতুলনীয় রূপসম্ভার ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য সম্পদ দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করলেন প্রভু। যে নিমায়ের সঙ্গে তিনি বাল্যে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়েছিলেন তাকে এর মাঝে খুঁজে পেলেন না।

এ সে নয়। এ নিমাই নয়। ইনি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত নবদ্বীপের মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

প্রভুর মূল্যবান ও সৌখিন বেশ-বাস দেখে চমকে গেল কৃষ্ণানন্দ। অন্তরে ঈর্ষা উদ্বেলিত হল। কিন্তু তাঁর সৌম্য শান্ত বিনয়াবনত মূর্তি কৃষ্ণানন্দের ঈর্ষানলে বারি সিঞ্চন করল।

তাঁর মনের আগুন নিভে গেল।

আলমবাগীশ সেখানে এসেছিলেন একটা বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে। প্রভুর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তাঁর মতবাদকে ভুল প্রতিপন্ন করতে। তাঁকে তর্কে পরাভূত করতে। কিন্তু তাঁকে দর্শন মাত্রেই তার সে মনোভাব বদলে গেল।

কৃষ্ণানন্দ হঠাৎ অভিভূত হয়ে পড়েন। নিজেকে তাঁর প্রভুর বশীভূত মনে হয়। প্রভু তন্ময় হয়ে গোপীনাম জপ করেন।

অভিভূতের মত কৃষ্ণানন্দ তাঁর মুখপানে চেয়ে দেখেন পলকহীন নয়নে। বিদায়কালে তবুও আলমবাগীশ প্রভুকে দু-একটা উপদেশ-বাণী বলবার লোভ সংবরণ করতে পারেন না। তিনি প্রভুকে অপরিণামদর্শী ও পথভ্রান্ত ভাবেন।

বলেন—তোমার ভজন সাধন শাস্ত্র-সঙ্গত নয় পণ্ডিত!

তার কথা প্রভুর কানে গেল কিনা কে জানে।

প্রভু মুখ তুলে তাকালেন না। কোন উত্তর দিলেন না। পূর্বের মত একাগ্র মনে গোপীনাম জপ করতে থাকেন।

—কৃষ্ণনাম জপ শাস্ত্রে আছে। গোপী নাম জপ অশাস্ত্রীয়। বিধি

বহির্ভূত। গোপী নাম ছেড়ে কৃষ্ণনাম জপ করো। ফল পাবে। প্রভুর মনে হয় কৃষ্ণানন্দ মথুরার লোক। তিনি মুখ তুলে বলেন, তুমি বৃথা চেষ্টা করছ। আমি কৃষ্ণের নাম মুখে আনবো না। কৃষ্ণ বড় নিষ্ঠুর। বড় কৃতঘ্ন।

আলমবাগীশ জিভ কেটে বলেন, ওকথা বলতে নেই। বললে অপরাধ হয়।

প্রভু রুক্ষস্বরে বলেন, তুমি কৃষ্ণের চর। আমাকে ভোলাতে এসেছো। তুমি বাইরে যাও।

কৃষ্ণানন্দ হতচকিতের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রভু ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠেন। বলেন, তুমি এখনো গেলে না। আচ্ছা তোমায় আমি বের করে দিচ্ছি। এই বলে একটা লাঠি তুলে নিয়ে কৃষ্ণানন্দের দিকে উঁচিয়ে ধরলেন।

—বাপরে! মারলে রে' বলে চিৎকার করতে করতে আলমবাগীশ পলায়ন করেন।

বাইরে অনতিদূরে তাঁর সহচররা অপেক্ষা করছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের কাছে গিয়ে বললেন, এখনি ব্রহ্মহত্যা হয়েছিল। পিতৃপুরুষের পুণ্যের বলে প্রাণে বেঁচে এসেছি।

ব্যাপার কি? প্রশ্ন করায় আলমবাগীশ সবিস্তারে বরং কিছুটা রঙ মাখিয়ে ব্যাপারটা বিবৃত করেন।

আলমবাগীশের দল প্রভুর উপর বা তাঁর মতবাদের উপর গভীর বীতশ্রদ্ধ। তারা প্রভুর নামে কুৎসা রটাবার একটা ছিদ্র পেয়ে উৎফুল্ল হল।

তারা সমস্বরে বলাবলি করে, নিমাই পণ্ডিত কি দেশের রাজা?

সর্বদিক দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের এই রাজকীয় জীবনযাত্রা একদল লোককে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। একজনের এই অপরিমিত সুখে অভাবী অপরজনের চোখ টনটন করে।

এই চিরন্তন মানবধর্ম।

এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। আর যেখানে দল সেই খানেই দলাদলি।

নবদ্বীপে প্রভুর ভক্তদলের সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি একটি বিরোধী দল গড়ে উঠল। তারা প্রভুকে মানতে চায় না। শ্রদ্ধার চেয়ে তাদের অশ্রদ্ধা বেশী। তাদের দৃষ্টিতে নিমাই পণ্ডিত দিব্যি পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে চালাচ্ছে। শুধু চালাচ্ছে নয় দেশের একজন হর্তাকর্তা হয়ে চালাচ্ছে।

জনপ্রিয় মানুষের শত্রুসংখ্যা অত্যধিক।

নিন্দুক ও ঈর্ষাপরায়ণ লোকের সংখ্যা তো বাঙলায় অল্প নয়।

একের হাসি। অপরের দীর্ঘশ্বাসেও অশ্রু।

নিমাই পণ্ডিত হাসি ও আনন্দের উৎস। হৈ-হুল্লোড় নেচে গেয়ে পরমানন্দে দিন যাপন করছে। তিনি সুন্দর। তিনি পণ্ডিত। তিনি বিজ্ঞ। তাঁর পরামর্শ দশের শিরোধার্য। তাঁর আদেশ দশের কাছে ঈশ্বরের আদেশ। তাঁর মহিমায় ও জয়গানে দেশ মুখরিত। নবদ্বীপের মত বিদ্বজ্জন সমাজে তাঁর এই অবাধ প্রতিপত্তি। ইতর জনের চোখ টাটাবে বৈকি! এত বিলাস বৈভব, এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এত মান, যশ প্রতিপত্তি সকলে সইতে পারে না।

পারল না একদল নবদ্বীপের লোক। তারা তলে তলে একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করেঃ নিমাই পণ্ডিতকে তারা শিক্ষা দেবে। তার নাগরালি ভেঙ্গে দেবে। তারা প্রভুকে প্রহার করবে।

প্রথমে তারা কানাকানি করে। পরে প্রভুর নামে কুৎসা রটায়ঃ শচীর বেটা গোঁসাই ঠাকুর হয়েছে। পরের মাথায় পা দিয়ে দিব্যি নাগর সেজে নবাবী করছে। ওর নাগরালি ঘুচিয়ে দিতে হবে। জগন্নাথ মিশ্রের খুব দম্ভ বেড়েছে। ছেলের দৌলতে।

এই আলমবাগীশের দল গিয়ে সেই বিরোধী দলের সঙ্গে হাত মিলাল। আলমবাগীশের ব্যাপারটা শাখা পল্লব বিস্তার করে তাদের কর্ণগোচর হল। ষড়যন্ত্রকারীব দল বৃদ্ধি পেল। কানাকানির নিশ্বাস প্রভুর কানে পৌছতে দেরী হল না। ভক্তদেরও কানে উঠল।

* অষ্টাদশ পল্লব *

—শুনেছো শ্রীপাদ! নগরে একদল লোক আমাকে প্রহার করবে বলে জোট পাকাচ্ছে।

প্রভু নিত্যানন্দকে বলেন।

নির্বাক নিত্যানন্দ লজ্জায় মাথা হেঁট করেন।

প্রভু বলেন, আমি এদের চিনি।

প্রভু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন পরে আবার বলেন, শ্রীপাদ আমি সন্ন্যাস নেব। আমি কৌপীন পরে, কমণ্ডলু হাতে নিয়ে, দুঃখী সেজে এদের দোরে ভিক্ষে করবো। আমার গার্হস্থ্য সুখ শেষ হলে এবং আমাকে দুঃখী দেখলে বোধ হয় আমার ওপর তাঁদের ক্রোধ উপশম হবে। তাদের দয়া হবে। তখন তারা স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে হরিনাম নেবে।

প্রভু কিছুক্ষণ আবিষ্টের মত স্থির হয়ে রইলেন। পরে আবার ভগ্নকণ্ঠে বলেন, শ্রীপাদ, তুমি সাক্ষী রইলে এবং চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রইল। আমার সন্ন্যাসে আমার প্রিয়জন বড় ব্যথা পাবে। হয়তো অনেক ভক্তের কাছে আমি নিন্দাভাজন হব। ক্ষোভে, দুঃখে অনেকে আমাকে ত্যাগ করবে।

করুক। তবে তুমি জেনে রাখ, আমি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী হচ্ছি না। আমি জীবের মনস্তুষ্টির জন্য ভিক্ষুক ও দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করছি।

প্রভুর মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের চিহ্ন দেখে নিত্যানন্দ চমকে গেলেন। প্রভু নিত্যানন্দকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বলেন, শ্রীপাদ, তোমরা আর আমায় দেখতে পাবে না। আমি এতদিন তোমাদের তুষ্টির জন্য সংসারে থেকে পরমানন্দে নৃত্য গীত করে দিন যাপন করছিলাম। কিন্তু জীবের তা সহ্য হল না। আমার

ওপর তারা খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। কাজেই আমাকে এখন সাংসারিক সকল সুখ বিসর্জন দিয়ে, তোমাদের মুখ না চেয়ে জীবের মনস্তুষ্টি করতে হবে। জানি তোমরা দুঃখ পাবে। অনেকেই দুঃখ পাবে। কিন্তু উপায় নেই শ্রীপাদ! উপায় নেই। আমি সন্ন্যাসী হয়ে, কৌপীন পরে যারা আমাকে মারতে চায় তাদেরই দোরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করবো।

প্রভুর অনমনীয় দৃপ্ত কণ্ঠ নিত্যানন্দকে কাঁপিয়ে তুলল। প্রভুর সঙ্কল্প শুনে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

নিত্যানন্দ বলেন, প্রভু! এত নির্দয় হয়ো না! মায়ের দশা কি হবে ভেবে দেখ।

—সেই ভেবেই তো সংসারের মাঝে থেকে এতদিন তোমাদের সঙ্গে কীর্তনান্দ উপভোগ করছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। সে সুখ আমার সহ্য হলো না। আমার সুখ দেখে জীব হরিনাম নিল না। তোমাদের মুখ চেয়ে সংসারে থাকলে দুর্গত জীবের উদ্ধার হয় না। কী করবো তুমি আমায় উপদেশ দাও শ্রীপাদ! আমি ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না। তোমাদের ও প্রিয়জনের সুখের জন্য সংসারে থেকে গার্হস্থ্য সুখ ভোগ করবো, না সন্ন্যাসী হয়ে কৌপীন পরে কাঙাল হয়ে দুর্গত জীবের উদ্ধার করবো?

শ্রীনিত্যানন্দ মাথা হেঁট করে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর গণ্ড বেয়ে দুই নয়নে অশ্রুর ধারা নামল। তাঁর বাক-রোধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীনিত্যানন্দ। পরে ধীরে ধীরে বলেন, প্রভু, আপনি শ্রীভগবান! শ্রীভগবান তাঁর দুর্গত ও তাপিত জীবের উদ্ধারের জন্য যদি কাঁথা-কমণ্ডলু ধারণ করেন, আমি বাধা দেবার কে? দিলেই বা তিনি শুনবেন কেন?

কিছুক্ষণ পরে শ্রীনিতাই আবার বলেন, আমি আমার জন্য বা অন্যান্য প্রিয় ভক্তদের কথা ভাবছিনে। প্রভু যেখানে যাবেন আমি

ছায়ার মত প্রভুর অনুসরণ করবো। উপবাসে, পথে-ঘাটে শীতে রৌদ্রতাপে কষ্ট হবে। সে-সব দুঃখ কষ্টের কথাও ভাবছি না। ভাবছি শুধু শচীমা আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কথা। তাদের অবস্থা কি হবে শুধু সেই কথাই ভাবছি।

নিত্যানন্দের কল্পনার আকাশে বিরহ-কাতর ও বিষাদক্লিষ্ট সেই মুখ দুখানি ভেসে বেড়াচ্ছে। আর তাকে আকুল করে তুলছে।

তাঁর চোখেব সামনে দিশাহীন অন্ধকার! অন্ধকারে তিনি পথ দেখতে পাচ্ছেন। অন্ধকারে তিনি এক সীমাহীন ভাবনার অকূল সমুদ্রে ভাসছেন।

তাঁর দুনয়নে অশ্রুর দুটি শীর্ণ ধারা। বিষাদ-বিনীত মুখে চেয়ে আছেন প্রভুর বিষণ্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে। আর প্রভু স্থির কমলায়ত প্রশ্নভরা নেত্রে চেয়ে আছেন নিত্যানন্দের পানে। নিত্যানন্দই যেন তাঁকে এই সমস্যা-সমাকুল দুর্গম পথের বাইরে নিয়ে যাবেন। একমাত্র নিত্যানন্দই যেন জানেন এই পথের সন্ধান। কতক্ষণ কে জানে। দুজনে এমনি আকুল জিজ্ঞাসু নয়নে পরস্পরের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে নিত্যানন্দ কণ্ঠে ভাষা পেলেন। বলেন, প্রভু ইচ্ছাময়। আমরা চিরদিন প্রভুর ইচ্ছাকেই শিরোধার্য করেছি। কখনও বিধি নিষেধেব বেড়া দিইনি। সে ধৃষ্টতা আমার অন্তত নেই। শ্রীনিত্যানন্দ সর্বশেষে প্রভুব চবণে একটি কাতব নিবেদন জানান: আমাকে যেমন বললেন, এমনিভাবে আর পাঁচজন ভক্তের কাছেও বলুন। দেখুন তারা কী বলেন। যাবার পূর্বে তাঁরা আপনার মনের কথা জানুন। আপনার বিরহ সহ্য করবার মত শক্তি সংহত করুন।

প্রভু আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হলেন। তার বিষাদ-মলিন আননে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

সান্ত্বনার মধুর কণ্ঠে বলেন, অধীর হয়ো না শ্রীপাদ। আমি এখনি যাচ্ছি না। যাবার আগে সকলকে বলে এবং সকলের সঙ্গে পরামর্শ না করে যাবো না। প্রভু সস্নেহে শ্রীনিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করেন।

শ্রীনিত্যানন্দের লোচনযুগল আবার অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তার আসন্ন বিয়োগ বিধুর দীর্ঘশ্বাস প্রভুর অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

"ভকতের দুঃখ দেখি ভকত বৎসল।
করুণ অরুণ আঁখি করে ছল ছল॥"

প্রভুর আঁখিপল্লব ও অশ্রুভারে সিক্ত হয়।

* ঊনবিংশ পল্লব *

—কে এলো? কে এলো? উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে প্রভু হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন: কে এলো? কে এলো?

প্রভু যেন কার অপেক্ষা করছেন। শুধু অপেক্ষা নয়, সর্বজ্ঞ প্রভু জানতেন কে আসছে। কেন আসছেন?

হ্যাঁ। জানতেন।

ঘরে প্রবেশ করলেন: কেশব ভারতী। শুদ্ধচিত্ত, সাত্ত্বিক ও পরম ভক্ত দ্বিজবর কেশব ভারতী।

কেশব ভারতীকে দর্শন মাত্রেই প্রভু অত্যন্ত চঞ্চল ও বিচলিত হয়ে ওঠেন। ভারতীও প্রভুকে পুলকিত ও বিস্ফারিত নয়নে বার বার নিরীক্ষণ করেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাঁকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখে ভারতী তাঁকে প্রশ্ন করেন কে তুমি? তুমি শুক না প্রহ্লাদ? ভারতীর মুখে এমনি প্রশস্তি শুনে প্রভু রোদন সংবরণ করতে পারেন না। তিনি কেঁদে ফেলেন।

ভারতী তখন নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দেন: তুমি শুক বা প্রহ্লাদ নও। তুমি কী আমিই বলছি শোন।

ভারতী যা বলেন শ্রীচৈতন্য ভাগবত থেকে উদ্ধৃত করলাম:

> "তুমি প্রভু ভগবান জানিনু নিশ্চয়।
> সর্বজন প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়॥
> এ বোল শুনিয়া প্রভু ব্যথিত অন্তর।
> ন্যাসী নমস্কারী বচন মধুর॥"

ভারতী বলেন,

> "তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়।
> সে কারণে যেথা সেথা দেখ কৃষ্ণময়॥"

প্রভু উতরোল হয়ে ওঠেন। মিনতি-সজল কণ্ঠে বলেন,

"বল বল ন্যাসীবর করুণা করিয়া।
কবে কৃষ্ণে অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া॥
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কবে দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথে মুঁই পাব॥"

কাটোয়া মহকুমার গঙ্গাতীরে এক বাঁধানো বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসী কেশব ভারতী বাস করেন। আজও কাটোয়া গঙ্গাতীরে সেই বটবৃক্ষ বর্তমান এবং তারই কাছে ভারতীর বংশধরদেব সন্ধান মেলে।

প্রভু ভারতীকে অত্যন্ত আদরযত্ন কবলেন এবং অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা দেখালেন।

* বিংশ পল্লব *

নিত্যানন্দ ছিলেন প্রভুর দ্বিতীয় সত্তা। প্রথমেই তিনি নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেন শ্রীনিত্যানন্দ সকাশে।

ইতিপূর্বে ইঙ্গিত ইশারায় শ্রীবাস অঙ্গনে অন্যান্য ভক্তদের কাছে কিছুটা ব্যক্ত করলেও স্পষ্টাস্পষ্টি তিনি প্রথম প্রকাশ করেন শ্রীনিত্যানন্দের কাছে। কথাটা এতদিন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। এইবার রূপ পরিগ্রহ করল। নিতায়ের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভক্ত পার্ষদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কিছু করবেন না।

কথাটা আগুনের শিখার মত ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রভু দুর্গত জীবের উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কাঙ্গাল সাজবেন। দোরে দোরে ভিক্ষা মাগবেন।

নবদ্বীপের বুকে একখানা বিষাদের কালো মেঘ নেমে এল।

নবদ্বীপবাসীরা বিশেষ করে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তদল চমকে গেছে।

কথাটা আর কোন দিক থেকেই চাপা রইল না।

বাইরে কথাটা এতোদিন হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছিল। এইবার সংবাদটা অন্তঃপুরে নারীমহলে পর্যন্ত পৌঁছিল।

শচীদেবীর কর্ণগোচর হল। বিষ্ণুপ্রিয়ার কানে গেল।

এঁদের দুজনের মাথায় বজ্রপতন হল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিলে এঁদের দুজনারই সর্বাধিক সর্বনাশ।

জননী ও পত্নী। এঁদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে তিনি সন্ন্যাস নেবেন।

এঁরা দুটিতেই তাঁর সব চেয়ে বড় বন্ধন। সব চেয়ে কঠিন নিগড়। সেই বজ্র বাঁধন দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলে তবে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে

হবে। সন্ন্যাস মন্ত্র নিতে হবে।

শচীদেবী বায়ু-রোগগ্রস্ত। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগেব অব্যবহিত পরেই তিনি এই রোগে আক্রান্ত হন। আজো তিনি নিরাময় ও সুস্থ হতে পারেন নি। আজো সেই নিদারুণ ব্যথার ঢেউ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

চলতি প্রবাদ আছে : 'ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।' শচীদেবীর অবস্থা অনেকটা সেই ধরনেব। সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁর বুক ঢিপ ঢিপ করে। মুখের রক্ত শুকিয়ে যায়। মনে হয়, বিশ্বরূপকে নিয়ে গেছে সন্ন্যাসীতে।

আবার নিমাইকেও নিয়ে যাবে। সন্ন্যাসীকে তাঁব ছেলে-ধরা মনে হয়। আতঙ্কে শিউবে ওঠেন।

তাই সেদিন কেশব ভাবতীকে দেখে চমকে উঠেছিলেন এবং খেদ কবে বলেছিলেন,

"সাধ ছিল নদীয়া বসতি।
কাল হয়ে এল মোর কেশব ভারতী॥"

শচীদেবী ইতিপূর্বে আটটি কন্যার শোক পেয়েছেন। বার্ধক্য তাঁর দেহ আশ্রয় করেছে। তার ওপর বিশ্বরূপের বিচ্ছেদ বিয়োগ ব্যথা এখনো ভুলতে পারেন নি। এমনি অবস্থায় আরেকটা মর্মভেদী দুঃসংবাদ তাঁর বক্ষপঞ্জরে আঘাত করল। সে আঘাতের তীব্রতা তাঁকে অস্থির ও আকুল করে তুলল না। পথিমধ্যে উন্মুক্ত আকাশ-তলে অকস্মাৎ মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত হলে যে অবস্থা হয় শচীদেবীর অবস্থাটা সেই রকম। হাহাকার করলেন না। কণ্ঠ থেকে একটি আর্তধ্বনি নির্গত হল না। তিনি বজ্রাহতের মত স্থির ও নিস্পন্দ হয়ে রইলেন।

মূর্ছিতও হলেন না। চোখে এক ফোঁটা জল দেখা দিল না।

সে এক অদ্ভুত অবস্থা। নিশ্চল নির্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে রইলেন

মূর্ছাহতের মত। আবিষ্টের মত।

নারীমহলের ধারণা শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করতে পারেন একমাত্র শচীদেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া।

প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নিত্যানন্দকে মায়ের অনুমতি না নিয়ে বা অন্তরঙ্গ পার্ষদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কিছু করবেন না, কাজেই নারীমহল শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল শ্রীগৌরাঙ্গকে বাধা দিতে। বিরত করবার জন্য।

প্রভুর প্রস্তাবটা যেন সকলের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। নিমায়ের মত পুত্র যে শচীদেবীর মত জননীকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এ কথা কে বিশ্বাস করবে?

দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধেই প্রভু জননীর কাছে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন কিন্তু পরক্ষণেই মায়ের জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত স্থবির জীর্ণ-শীর্ণ দেহের পানে চেয়ে এবং বিষাদ-কাতর মলিন মুখের পানে লক্ষ্য করে তাঁর সাহস স্তিমিত হয়ে এলো। তাঁর মানসচক্ষে ভেসে ওঠে নিজের অনুপস্থিতিতে মায়ের কল্পিত দৈন্যাবস্থার প্রতিচ্ছবি। মহাপ্রভুব সমস্ত উৎসাহ ও সাহস নিভে গেল। চাঁদের মত মুখখানি নিষ্প্রভ ও মলিন হয়ে গেল। তিনি বিষাদ-বিনীত অধোবদনে দাঁড়ালেন।

মায়ের মনে করুণা জাগে।

মহাপ্রভু আর্দ্রকণ্ঠে অশ্রু-বিগলিত নয়নে ডাকেন, মা! মা আমার!

শচীদেবী মুখ তুলে ছেলের বিশুষ্ক মুখের দিকে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

প্রভু ভগ্নস্বরে বলেন, মা! আমার অশুভ লগ্নে জন্ম হয়েছিল। আমি অপদার্থ। বৃথা সন্তান। সন্তানের কোন কর্তব্য পালন করতে পারলুম না। তোমার পদসেবা করতে পেলুম না।

প্রভুর দু'নয়নে অশ্রুর ধারা।

শচীদেবীর নয়ন শুষ্ক। তিনি অবিচলিত পলকহীন নয়নে পুত্রের মুখ পানে চেয়ে আছেন। যেন শেষ দেখা দেখছেন।

প্রভু আবার বলেন, মা মাতৃঋণ কখনো পরিশোধ করা যায় না। আমিও পারবো না। তুমি আমার দয়াময়ী মা, তুমি নিজগুণে সে ঋণ পবিশোধ করে নিও।

প্রভু এইবাব কৃতাঞ্জলি হয়ে ব্যথিত বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে অনুনয় করেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তোমাকে না বলে কোথাও যাবো না। প্রতিশ্রুতি পালন কবছি। এইবাব তুমি আমাকে মুক্তি দাও মা। আমি আমার কৃষ্ণ অন্বেষণে যাই।

—আমার হিতই তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এতে আমার মঙ্গল হবে। তুমি সানন্দে ও স্বচ্ছন্দে অনুমতি দাও মা, আমি কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাই।

শচীমাতা নিবাক ও স্তম্ভিত হয়ে পুত্রের মুখপানে চেয়ে রইলেন। উত্তব দেবাব ভাষা যোগাল না।

হঠাৎ তাঁর ঠোঁট দুখানি ঈষৎ কেঁপে ওঠে। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, বিষ্ণুপ্রিয়া ?

প্রভু মাথা নত কবে রুদ্ধ স্বরে উত্তর দেন, তার কোন দুঃখ হবে না মা। আমি যদি নিজেব সুখেব জন্য অন্যে আসক্ত হয়ে তাকে ত্যাগ কবতাম, সে দুঃখ পেত। আব যদি আমার মৃত্যু হতো, তার দুঃখের কারণ হতো। কিন্তু আমি থাকবো। থাকবো একটু দূরে। আমি যে পথ অবলম্বন করতে চলেছি তাতে তার এবং আমার উভয়েরই মঙ্গল হবে। তার দুঃখের তো কোন হেতু নাই। তার জন্য তুমি চিন্তা করো না মা। সে আমার বিকল্প। আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তোমার সেবা করতে পারবে। তার দুঃখে জীবের উপকার হবে। তোমরা দুজনে পরস্পরের ব্যথার সাথী হবে। আমাকে স্মরণ করে ব্যথা অপনোদন করবে। আর স্মরণ করবে

কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ চরণে মতি রাখবে। প্রিয়াকে কৃষ্ণনাম শিক্ষা দেবে। এই জরাজীর্ণ শোক সন্তাপতা নারীর বুকে অপরিমেয় সাধের সমুদ্র ছিল, নিমাই তাঁর বড় পণ্ডিত হবে। দেশজোড়া হবে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি। আনবে তাঁর সুন্দরী পুত্রবধূ। পৌত্র পৌত্রীর আনন্দ কলরবে তাঁর গৃহ মুখরিত হবে। গৃহ হবে তাঁর আনন্দ নিকেতন। সেই আনন্দের হাটে তিনি একদিন বেচা-কেনা শেষ করে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়ে যাবেন।

চিরকালীন জননীর মত তাঁরও হৃদয়ে ছিল অফুরন্ত সাধ।

সাধ তাঁর মিটে ছিল। পেয়েছিলেন সবই তিনি। অঞ্জলি ভরে তাঁকে দান করেছিলেন তাঁর ভাগ্যবিধতা। কিন্তু সব পেয়েও তিনি কিছুই ভোগ করতে পেলেন না। অকালে সব হারাতে হল। আঁচল ভরে দিয়ে আবার সব কেড়ে নিলেন।

কত ঝড়ই না সহ্য করতে হয়েছে ঐ ঝাঁঝরা বুকে। যা বা বাকি ছিল, নিমায়ের মুখ চেয়ে যে দুর্দৈব তিনি এতদিন সহ্য করেছিলেন, তাঁর জীবনের শেষ সান্ত্বনা, তাঁব শেষ অবলম্বনটুকুও নিষ্ঠুর বিধি কেড়ে নিতে বসেছেন। তাঁর সমস্ত সুখসাধ অশ্রুর আকারে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ে তার বিশীর্ণ গণ্ড বেয়ে।

তিনি মাঝে মাঝে মুখ তুলে প্রভুব মুখপানে চেয়ে দেখেন। সে মুখে দুর্গত জীবের প্রতি অপার করুণা। জগৎহিতায় তাঁর এই অকরুণ অভিযান। করুণার সাগর শুধু অকরুণ তার বৃদ্ধা জননী ও তরুণী ভার্যার প্রতি।

পরক্ষণেই আবার শচীদেবীর মনে হয় তিনি নিমায়ের প্রতি অবিচাব করছেন। নিমাইকে অকরুণ ভেবে অন্যায় করছেন। এ তার নিয়তি। তার বিধর বিধান। এর মাঝে তার সুখ ও মঙ্গল নিহিত আছে। জীবের মঙ্গলের ও কল্যাণের জন্যই তার অস্তিত্ব। দুর্গত জীবের প্রতি অগাধ মমতা।

মায়ের কল্পনার আকাশে তখন তাঁর ননীর পুতুলী নিমাই ভিক্ষার কমণ্ডলু হাতে নিয়ে কৌপীন পরিধান করে রৌদ্রদীপ্ত আকাশের নিচে দূর পথে হেঁটে চলেছেন। ননী-কোমল রাঙা চরণ ফেটে রক্ত ঝরছে। ঘর্মাক্ত দেহ। রৌদ্র তাপে মুখ আরক্ত। ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করছেন। কে তাকে ঐ চালগুলো সেদ্ধ করে দেবে? কে তার মুখে তুলে দেবে সেই অন্নের গ্রাস?

ভাবতে মায়ের বুক ফেটে যায়। নিমাই রৌদ্রদগ্ধ অবারিত আকাশ তলে দূর দূরান্তরে হেঁটে চলেছে। তার ক্ষুধায় অন্ন নেই। পিপাসার জল নেই। সঙ্গী নেই। সাথী নেই।

সন্তানের এই স্বেচ্ছায় কৃচ্ছসাধন মায়ের বুকে আঘাত করবে বই কি!

শচীদেবী নিমীলিত নয়নে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

শচীদেবী মনে মনে জানতেন যে এদিন তাঁর আসবে। এ বাজ তাঁকে বুক পেতে সহ্য করতে হবে। এত সুখ সম্পদ ও আনন্দ তার সইবে না।

যে আকাশে চাঁদ হাসে সেই আকাশের বুকেই বাজ লুকোন থাকে। এ কথা বোঝেন বই কি শচীদেবী।

হ্যাঁ। নিমাই যে তাঁকে ছেড়ে যাবে এ কথা তিনি জানতেন। পূর্ব থেকেই তিনি এর আভাস পেয়েছিলেন।

মায়ের মন সন্তানের মনের গভীরে ডুব দিয়ে থাকে।

মা সেখানে অন্তর্যামী।

অনেকক্ষণ পরে একসময় শচীদেবী কাতর নয়নে প্রভুর পানে চোখ তুলে বলেন, নিমাই, তোমার কল্যাণের জন্য আমি সব দুঃখ কষ্ট সইতে পারি এবং সইব। কিন্তু পরের মেয়ে, আমার নির্দোষী বউমাকে কি বলে প্রবোধ দেব?

প্রভু অপরাধীর ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করেন।

মা বলেন,

> "সর্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ
> না জানি কি লাগি মোর বিধাতা দারুণ ॥"

মায়ের কাতর কণ্ঠস্বর তীব্র আর্তনাদের মত প্রভুর বক্ষতটে আছড়ে পড়ে। প্রভু বলেন, মা! তোমার বুকফাটা কাতরধ্বনি শুনে আমার যেতে ইচ্ছা করে না। তোমাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে আমি যেতে পারবো না। যদি হৃষ্টচিত্তে আমায় অনুমতি ও বিদায় দিতে পারো; আমার সুখ ও মঙ্গলের জন্য তবেই আমি যাব। এও কি সম্ভব? মা হৃষ্টচিতে প্রফুল্লমনে পুত্রকে অনুমতি দেবেন, তুমি সন্ন্যাসী হও! কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হল।

শচীদেবী পরাস্ত হলেন একমাত্র পুত্রের বায়নার কাছে। মুক্তকণ্ঠে বলেন, যদি তুমি সুখী হও বা তোমার মঙ্গল হয়, আমি তোমাকে অকপটে ও হৃষ্টমনে অনুমতি দিলাম।

স্নেহের কাছে মাতৃত্বের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

* একবিংশ পল্লব *

মায়ের কাছে অনুমতি আদায় করে প্রভুর মনে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা।

মনে ভয় পাচ্ছে তিনি কোন দৃশ্যের অবতারণা করেন। তাঁকে বুঝিয়ে তাঁর সম্মতি পেলেই প্রভু অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

কিছুদিন পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া পিতৃগৃহে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বাস করছিলেন। হঠাৎ তিনি সেখান থেকে পতিগৃহে প্রত্যাগমন করেন। পিতৃগৃহে অবস্থান কালেই প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের জনরবটা তার কানে ভেসে যায়। তিনি জনরবটার মূলে কোন ভিত্তি আছে কিনা জানবার জন্যই অস্থির হয়ে ওঠেন এবং অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তন করেন।

মায়ের কাছে এবং স্বামীর কাছে তিনি শুনতে চান এ কানাকানির অর্থ কি? আসলে বিষ্ণুপ্রিয়া কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন নি, অথচ মিথ্যা বলে নিঃসংশয়ে উড়িয়ে দিতেও পারেন নি। সংশয় দোলায় দুলতে দুলতে আপনা আপনি স্বামীর কাছে ফিরে এলেন।

শচীদেবী প্রিয়াকে কাছে পেয়ে খুশি হলেন। প্রভু হয়তো কিছুটা বিব্রত হলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপে পা দিয়েই বুঝতে পারলেন কথাটা শুধু ধোঁয়া নয়। তার নিচে আগুন আছে এবং কথাটা নবদ্বীপের সর্বত্র আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রমাদ গণলেন এবং উৎকণ্ঠিত হলেন মা ও স্বামীর কাছে শোনবার জন্য।

তিনি ধৈর্যহারা হয়ে ওঠেন।

যদিও শাস্ত্রে বলে 'অশুভস্য কাল হরণং' তবুও এই প্রাণঘাতী

নিদারুণ সংবাদ বুকে করে কে কাল হরণ করতে পারে ?
পারলেন না অল্পবয়সী, আসন্ন যৌবনা চঞ্চলমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী।
তিনি আর অপেক্ষা করতে পারেন না। সেই রাত্রেই স্বামীর কাছে শুনতে চান তার মনের কথা।
অনিরূপিত ভাগ্য নিয়ে সংশয় দোলায় আর তিনি দুলতে পারবেন না।

কাল রজনী।
ভোজন শেষ করে সবেমাত্র প্রভু শয়নকক্ষে খট্টাঙ্গে শয়ন করেছেন।
একটু তন্দ্রার আবেশ এসেছে।
ধীর পায়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী রাত্রিবাস পরিধান ও অঙ্গপ্রসাধন করে শয়নকক্ষের দ্বারদেশে এসে দাঁড়ান। স্তিমিত আলোকে ভিতরের পানে দৃষ্টিপাত করে তাঁর মনে হয় প্রভু নিদ্রিত। নিঃশব্দে রুদ্ধশ্বাসে তিনি ভিতরের পানে চেয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিদ্রিত স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চান না।
স্বামী-সেবা করতে এসেছেন তিনি। হাতে তাঁর স্বামী-পূজার উপচার। পান, চন্দনের বাটি এবং একগাছি পুষ্পমাল্য।
বাইরে থেকেই অনেকক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করেন নিদ্রিত স্বামীকে। ফেনপুঞ্জের ন্যায় শুভ্র শয্যায় শায়িত নিদ্রিত নারায়ণকে। দেহ নয়। যেন ফুলের দণ্ড। চাঁদের সুষমা। শুভ্র শয্যার ওপর যেন জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। শিথানের ওপর মাথাটি এলিয়ে পড়েছে। মুখের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়েছে আলুথালু চাঁচর চিকুর কেশ। মুখ নয় যেন একটি ফুটন্ত পদ্ম। মুখপদ্ম বেষ্টন করে কৃষ্ণ কেশরাশি শোভা পাচ্ছে কাজল মেঘের কোমল কালো'র মত। তারই বুকে শ্রীমুখ যেন বিদ্যুৎচমক।

"মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা যেন হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

সে রূপের তুলনা হয় না। বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে পলক পড়ে না। দেখে দেখে দেখার সাধ মেটে না।

"নয়ন না তিরপিত ভেল।"

বিষ্ণুপ্রিয়া আজ তাঁকে নতুন চোখে দেখছেন। নতুন করে দেখছেন। হারাতে হবে ভেবে দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে লেহন করছেন। সে দেখা আর ফুরোতে চায় না। সে দেখার শেষ নেই।

না। দূর থেকে দেখে তাঁর তৃপ্তি হল না। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে শয্যার উপর উঠে বসেন।

বসেন স্বামীর পদপ্রান্তে। দৃষ্টি ঠিকরে যায় স্বামীর ঘুমন্ত মুখপানে। ঘুমন্ত মুখের শোভা যেন আরো বেড়েছে। প্রসন্ন প্রশান্ত মুখ আরো কমনীয় ও জ্যোতির্ময় হয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া উসখুস করেন, পদকমলযুগল কোলে তুলে নিয়ে সেবা করবার লোভে। কিন্তু পারেন না। পাছে স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে।

শীতের রাত্রি। স্বামীর চরণ কমল শীতবস্ত্রে আবৃত। সে চরণ অনাবৃত করে স্পর্শ করতে তার সাহস হয় না। শীতল করস্পর্শে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হবে।

অথচ পদসেবার লোভ তাঁর মনে উদ্দাম হয়ে ওঠে। তাঁর স্পর্শ পাবার জন্য করপল্লব দুখানি নিসপিস করতে থাকে। অতি কষ্টে সে লোভ সংবরণ করতে হয় শ্রীমতীকে।

নিজের শীতল করপল্লব দুখানি ঈষৎ উষ্ণ করবার জন্য নিজের হাত দুখানি উষ্ণ আবরণের নিচে রাখেন।

স্পর্শ পান স্বামীর উষ্ণ চরণ কমলের।

কিন্তু স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয় না। অতি সন্তর্পণে পদপল্লব দুখানি নিজের কোলের উপর স্থাপন করেন সযত্নে। পরে নিজে ঈষৎ অবনত হয়ে শ্রীচরণ দুখানি নিজের বক্ষে ধারণ করেন।

স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর মনে হয় তাঁর এই ক-দিনের দুঃশ্চিন্তার দুঃখভার নিঃশেষ হয়ে গেল। নির্বাপিত হল তাঁর সন্তাপের অগ্নিশিখা। দূর হল তার অহেতুক ভয় ভ্রান্তি।

তাঁর সর্বশরীর সেই স্পর্শের কুহকে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয় ঘুমের ঘোরে স্বামীর মুখখানি নির্মল ও নির্মেঘ অবারিত আকাশের মত প্রসন্ন ও প্রশান্ত হয়ে ওঠে।

শ্রীমতী নিমেষহীন নয়নে স্বামীর প্রফুল্ল মুখপানে চেয়ে থাকেন। পুরুষের এত রূপ তাঁর ধ্যান ধারণার অতীত।

বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হয়। নিজেকেও তাঁর রূপসী মনে হয়।

রূপসী সুনিশ্চিত। স্বামী যার এত রূপবান নিজেও সে রূপসী তাঁরই রূপের প্রভায়।

নারী মাত্রেই স্বামী গরবে গরবিনী। স্বামী তার দ্বিতীয় সত্তা। স্বামীর ভাগ্যই তার ভাগ্য। নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হয় শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার।

হ্যাঁ। ভাগ্যবতী বই কি! এ হেন যাঁর স্বামী, তিনি ভাগ্যবতী বই কি!

কত জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফলে এমন স্বামীভাগ্য লাভ করা যায়। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেন, নিজেকে তাঁর ধন্য মনে হয়। হঠাৎ তাঁর দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হতে থাকে। তাঁর মনের আকাশ কালো মেঘে মেঘে আবৃত হয়ে যায়। কিসের একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি হঠাৎ ভীত ও ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। কী যেন হারাতে বসেছেন। কী যেন শূন্যে পাখা বিস্তার করে উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে তাঁর নাগালের বাইরে। তিনি ধরবার চেষ্টা করেও ধরতে পারছেন না। তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

তাঁর কান্না পায়।

উদ্গত অশ্রুতে তাঁর নয়ন পল্লব দুটি ভিজে ওঠে।

তিনি স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করে কাঁদতে থাকেন। ফোঁটায় ফোঁটায় উষ্ণ অশ্রু ঝরে পড়ে স্বামীর পদপল্লবে।

প্রভুর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

প্রিয়া কাঁদছেন। স্বামীর চরণকমল দুটি বুকে চেপে ধরে ফুলে ফুলে অঝোরে কাঁদছেন তার বিষ্ণুপ্রিয়া।

উন্মিলিত নয়নে প্রভু চেয়ে থাকেন সেই রাহুগ্রস্ত মুখশশীর পানে।

বুকে ব্যথা বাজে।

বুক ভারী হয়ে ওঠে প্রিয়জনেব ব্যথায়। বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁরও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

কণ্ঠে ভাষা পান না। প্রবোধ দেবার ভাষা। সান্ত্বনা দেবার বাক্য। তিনি নিঃশব্দে চেয়ে থাকেন শ্রীমতীর অশ্রুপ্লাবিত ব্যথিত মুখের পানে।

বর্ষা-বিধৌত চন্দ্রমার মত সে মুখের শ্রী। শিশির সিক্ত পরিম্লান কুসুমের মত সে মুখের কমনীয়তা।

প্রভু চোখ ফেরাতে পাবেন না। শ্রীমতীর আকুল ক্রন্দন প্রভুকে ব্যথিত ও ব্যাকুল করে তোলে।

তিনি স্থির থাকতে পারেন না।

সহসা শয্যাপ্রান্তে উঠে বসেন।

আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেন শ্রীমতীকে।

"দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর
চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারা॥

মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি,
কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে
পুছে বাণী মধুর অক্ষর ॥"

শ্রীমতীকে জানুর উপর বসিয়ে, দক্ষিণ করে চিবুক স্পর্শ করে মধুর কণ্ঠে বলেন, কাঁদছো কেন প্রিয়ে?

তুমি মোর প্রাণপ্রিয়া, কি কারণে কাঁদছো তাই বলো।

প্রভুর আদরে সোহাগে ও মধুর আপ্যায়নে শ্রীমতী গলে গেলেন কিন্তু কান্না থামল না।

ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তাঁকে বিপর্যস্ত করে তোলে। উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে তাঁর বাকরোধ হল। তিনি কথা বলতে পারেন না। নিঃশব্দে রোদন করেন।

প্রভু ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মিনতি কাতর কণ্ঠে বলেন, কেন, তুমি আমায় দুঃখ দিচ্ছ প্রিয়ে? বলো কিসের ব্যথা তোমায় এমন আকুল করে তুলল? কিসের দুঃখ?

বিষ্ণুপ্রিয়া ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মাণ। প্রভুর ক্রোড়ের উপর তাঁর তন্বী দেহটি মৃদু মৃদু কাঁপছে বায়ু-বিতাড়িত লতার মত।

প্রভু আবার কাতর মিনতির স্বরে বলেন, বলো। বলো প্রিয়া! বলবে না আমায়?

প্রিয়া শক্তি ও সাহস সংহত করে বলেন, তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে যাবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া কি বলতে চান প্রভুর বুঝতে বাকি থাকে না। তিনি যে তাঁর সন্ন্যাসের প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে চান, এ কথা বোঝেন, তবুও তিনি সোজাসুজি আরো স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর কাছ থেকে শুনতে চান। তাই বলেন, আমাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বল।

আমিও তোমাকে স্পষ্ট উত্তর দেব।

এইবার শ্রীমতী সরাসরি প্রভুকে প্রশ্ন করেন, তোমার দাদা যা করেছেন, তুমিও নাকি তাই করবে?

সহজ সরল প্রশ্ন। কিন্তু প্রভুর কাছে অত্যন্ত জটিল ও সমস্যা সঙ্কুল মনে হয়।

তিনি নিঃশব্দে ক্ষণকাল প্রিয়ার মুখপানে চেয়ে পরে সহাস্যে উত্তর দেন, এ কথা তোমাকে কে বললে? মিছামিছি এই সব ভেবে কেন দুঃখ পাও? আমি যদি যাই তবে তোমাদের অনুমতি নিয়ে যাবো। এখন ওসব মন থেকে মুছে ফেল। চোখের জল মোছ। হাসো দেখি প্রাণ খুলে। চাও দেখি মুখ তুলে। কতদিন পরে দেখা পেলাম। কত সাধ-আহ্লাদে বুক বোঝাই করে ঘরে এলুম। আর তুমি কিনা অনর্থক কান্না-কাটি করে রাত্রিটা মাটি করে দিলে? বাজে কথা ভুলে এখন শুধু প্রাণভরে হাসো আর আমাকে হাসতে দাও।

প্রিয়া বোঝেন এ সব মন ভোলান সোহাগ। তিনি বলেন, মাথা খাও। আমাকে ঠিক বলো। সংশয়ে আমি আধমরা হয়ে আছি। আর সংশয়ে রেখো না।

—অন্য কথা কও। দুটো প্রেমের কথা, ভালবাসার কথা বলো। আমি কি তোমাকে কম ভালোবাসি? তোমাকে ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? ও-সব কথা মনে ভাবো কেমন করে তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

এমনিভাবে আসল প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে প্রভু হাস্যকৌতুক ও প্রমোদ পরিহাসে শ্রীমতীকে ভুলিয়ে রাখেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর আদরে সোহাগে গলে যান কিন্তু মনে স্বস্তি পান না।

স্বামী হাসেন কিন্তু তাঁর কান্না পায়। তিনি যেন সেই হাসির নিচে

কান্নার শব্দ শুনতে পান। তিনি ক্ষণে ক্ষণে স্বামীর মুখপানে চেয়ে চেয়ে দেখেন।
স্বামীর হাসি অকারণ মনে হয়। সে হাসির রূপ নেই। ছন্দ নেই। তার যেন প্রাণ নেই। তাঁর মনে হয় অন্তরের কান্নাকে মুখের হাসি দিয়ে আবৃত করে রাখছেন। স্বামীকে কেমন তার নতুন মনে হয়। তাঁর হাবভাব ধবন ধাবণ সব যেন নতুন।
বিষ্ণুপ্রিয়া অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

রাত্রি বিগতপ্রায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করেন, তুমি কাঁদছো কেন ?
প্রভু চমকে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়ার অতর্কিত ও অবান্তর প্রশ্নে। ভীত হন তাঁর বিবর্ণ পাংশু ও রক্তহীন মুখেব পানে চেয়ে। সে মুখের প্রতিটি রেখায় হতাশার গভীব চিহ্ন।
প্রভু কুটিল হাসি হাসেন। নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দেন, কই ? না তো। এই তো আমি হাসছি।
বিষ্ণুপ্রিয়া খুশি হতে পারেন না স্বামীব কথায়। তিনি প্রভুর হাত দুখানি তুলে নিয়ে নিজের বক্ষে স্থাপন করে শঙ্কিত কণ্ঠে বলেন, তোমার ভাবগতিক আমার ভালো মনে হচ্ছে না। তুমি যেন আমার সঙ্গে ছলনা করছ মনে হচ্ছে। আমার ভয় করছে।

"প্রভুব কর বুকে নিয়া,
পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
মিছা না বলিহ মোর তরে।
হেন অনুমান করি যত কহ সে চাতুরী
পলাইবে মোর অগোচরে॥"

প্রভু ধরা পড়েছেন শ্রীমতীব কাছে। হঠাৎ গম্ভীর হযে যান প্রভু গাঢ়স্বরে বলেন, প্রিয়ে! আমার মঙ্গলে তোমার মঙ্গল। তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল। উভয়ের মঙ্গল ও মনস্কামনা পূর্ণ হবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন কবলে। তুমি তাই কব। আমিও তাই করি। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। নামেব মর্যাদা রাখো। নাম সার্থক করো।

কথার মর্ম বুঝলেন প্রিয়াদেবী। তাঁর অন্তর কেঁপে ওঠে। তবু তিনি স্থিব থাকেন। মনে মনে সঙ্কল্প করেছেন, প্রভুর সামনে বিচলিত হবেন না। চাঞ্চল্য প্রকাশ করবেন না। তিনি অবিচলিত অকম্পিত কণ্ঠে বলেন, তুমি এক কাজ করো। বাড়ী ছেড়ে যেয়ো না। আমি বরং বাপেব বাড়ী থাকবো। তোমার কাছে আসবো না। তুমি মা-কে ছেড়ে গেলে মা বাঁচবেন না। মা মবে গেলে পাঁচের কাছে তোমায় নিন্দাভাজান হতে হবে। লোকে তোমার নিন্দা করবে। অকথা কুকথা বলবে।

আবো অনেক কথা তাঁব বলবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বলতে পরেলেন না। বা বলা হলো না।

আবাব বলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমার কাছে আমি আসবো না। তুমি মা-কে হত্যা করো না।

প্রভুব মনে করুণার আভাস জাগে। তিনি করুণার্দ্র নয়নে বিষ্ণুপ্রিয়ার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কবেন। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হ্যাঁ। আমি সন্ন্যাসী হব। কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা অটুট থাকবে। আমাদের বিচ্ছেদ বিয়োগ ব্যথা আমাদের উভয়কে কাতর করে তুলবে জানি। তবুও সে ব্যথা আমরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য ও জগতের হিতের জন্য। এতে তোমার ও আমার উভয়েরই মঙ্গল হবে। জগতের কল্যাণ হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া হতাশ নয়নে স্বামীর দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,

এ আমার নিয়তি। বিধি আমার অদৃষ্টে লিখেছেন পতি বর্তমানে বৈধব্য। তুমি করবে কী?

বিষ্ণুপ্রিয়া এতোক্ষণে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে জড়িত অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করেন, কিন্তু এ সব কি স্বপ্ন না সত্য?

আমার অদৃষ্টে কি আছে তাই আমাকে স্পষ্ট বলো।

নিজেকে সংবরণ করা এইবার প্রভুর পক্ষে দুষ্কর হয়ে ওঠে। তার দুই নয়নে অশ্রুর প্লাবন। কণ্ঠ রুদ্ধ হৃদ্‌স্পন্দনের দ্রুততা বেড়ে যায়। সর্বশরীরে কম্পন অনুভব করেন। তাঁর বাকশক্তি বিলুপ্ত হয়ে আসে। প্রবোধ দেবার ভাষা যোগায় না। তবুও তিনি কোনরকমে নিজেকে সংযত করে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ভগ্নকণ্ঠে বলেন, প্রিয়ে! প্রেমময়ী! না এ স্বপ্ন নয়। এ মিথ্যা নয়। এ কঠোর সত্য। দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করে তোমাকে ত্যাগ করে যাব। এ আমাকে করতেই হবে। ঐ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই।

একটু থেমে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোমল করপল্লব দুখানি শ্রীহস্তে তুলে নিয়ে অনুনয় করেন: এইবার মায়ের মত হৃষ্টচিত্তে তুমিও আমায় অনুমতি দাও প্রিয়ে, আমি কৃষ্ণঅন্বেষণে বৃন্দাবনে যাই।

মায়ের নাম উচ্চারিত হতেই শ্রীমতী জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রভুর মুখপানে তাকান।

প্রভু দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন, হ্যাঁ। মা আমায় স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন।

প্রভুর আবেদন নিবেদন বা নিরুপায়তা বোধ হয় সংসার অনভিজ্ঞা সরলা কিশোরীর মনে রেখাপাত করতে পারে না। বিষ্ণুপ্রিয়া অধৈর্যের মত আকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন, তাহলে আমি বিষ খাবো কিংবা গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, তবু তোমায় আমি বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না। বাড়ী ছেড়ে, মাকে ছেড়ে তুমি যেও না। লোকে তোমার

নিন্দা করবে। সে নিন্দা আমি সইতে পারবো না। মাকে ছেড়ে গেলে তোমার অধর্ম হবে। মাকে ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে যেও না।

—আমি সাধ করে বাড়ী-ঘর, সংসারের সুখ, তোমাদের অগাধ স্নেহ মমতা ছেড়ে যেতে চাইছি না। আমায় ঘরে রাখতে চেও না। ঘরে থাকলে আমার সুখ হবে না। মঙ্গল হবে না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বৃন্দাবনে যাই। নইলে আমি বাঁচবো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া এইবার তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। বলেন, বেশ। বৃন্দাবনে গেলে যদি তুমি সুখী হও তাই যাও। তবে আমাকে সঙ্গে নাও। শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসে গিয়েছিলেন তখন সীতা দেবীকে তো সঙ্গে নিয়েছিলেন।

—তুমি বিস্মৃত হচ্ছ প্রিয়ে। সে যাওয়া আর এ যাওয়ার মাঝে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এ আমি সন্ন্যাসী হতে চলেছি সর্বহারা সর্বত্যাগী হয়ে। তোমাকে সঙ্গে নিলে সন্ন্যাসের কোন অর্থ থাকে না। সন্ন্যাস না নিলে আমি জীবের করুণা পাব না। আমাকে কাঙাল হতে হবে। তোমাকে কাঙালিনী হতে হবে। নইলে জীবের দয়া হবে না। প্রিয়ে কাঁদবার জন্যই আমার জন্ম। কান্নাই আমার অস্তিত্ব। সংসারে থেকে এতোদিন কাঁদলুম। কিন্তু আমার সুখ দেখে তাদের দয়ার উদ্রেক হল না। তারা কেউ হরিনাম নিল না। এইবার সর্বহারা কাঙাল হতে হবে তাদের মঙ্গলের জন্য। জগতের হিতের জন্য। প্রিয়ে! তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চাও কেন? আমি তো তোমা-ছাড়া নই। যেখানেই থাকি তোমার কাছেই আছি। তুমি আমার কাছে আছ। আমি তোমারই। তোমা ছাড়া এক মুহূর্তও নই। প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি হৃদয় স্পন্দনে তোমাকে আমি কাছে পাই। অনুভব করি তোমার উপস্থিতি। শুনতে পাই তোমার পদশব্দ। তোমার কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার। সর্বক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি তোমার মধুর

স্পর্শ। আমি বিভোর হয়ে থাকি তোমার চিন্তায়। তুমিও তেমনি সর্বক্ষণ আমাকে হৃদয়ে রেখে তোমার বিরহ যন্ত্রণা ভুলে যেও। আর কায়িক বিচ্ছেদই বিয়োগ নয়। যেখানে প্রীতির অভাব নেই সেখানে চোখের আড়াল হলেই বিচ্ছেদ ঘটল না। প্রীতির অভাবই আসল বিচ্ছেদ। তার ব্যথা দুঃসহ। আমি দূরে গেলেও আমি তোমার। তোমার জন্য রইল আমার অন্তরের প্রীতি, প্রণয় ও স্নেহ। তারই মাঝে অবগাহন করে তুমি তোমার বিরহ তাপ দূর করবে। তুমি আমাকে বাধা দিও না প্রিয়া। আমি দুর্গত জীবের ব্যথায় ব্যথিত। তাদের দুঃখে আমি মর্মান্তিক আহত। তাদের জন্য আমায় কিছু করতে দাও। তুমি আমার ধর্মপত্নী। তুমি আমার ধর্মকাজে সহায় হও। আমায় উৎসাহ দাও। আমায় মন্ত্রণা দাও। প্রিয়া, মনে আছে উত্তররাম চরিতের শ্লোকটা—

"সচীব সখিমিথ প্রিয়শিষ্যা ললিত কলাবিধৌ।"

তুমি আমার সেই স্ত্রী। আমার সচীব। তুমি আমায় পথভ্রষ্ট করো না প্রিয়া! আমায় হৃষ্টমনে অনুমতি দাও। প্রভু তাঁর করপল্লব দুখানি হাতে তুলে নেন।

হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া ধরাশায়ী হলেন। তিনি মূর্ছিতা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

প্রভু বিব্রত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন। সযত্নে মাটি থেকে তুলে নিয়ে আর্তকণ্ঠে বলেন, ওঠ প্রিয়া, আমাকে নারীহত্যার পাপে লিপ্ত করো না। আমাকে কৃপা কর প্রাণেশ্বরী। ওঠো। ওঠো।

বিষ্ণুপ্রিয়া যখন সম্বিত ফিরে পেলেন, তখন সেখানে আর তাঁর স্বামীকে দেখতে পেলেন না। স্বামী ঘর থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন বা রূপান্তরিত হয়েছেন শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু মূর্তিতে।

মূর্ছাহত বিষ্ণুপ্রিয়া স্তম্ভিত। ভক্তি আপ্লুত নয়নে চেয়ে থাকেন সেই অপূর্ব মূর্তির পানে। তারপর ধীবে ধীবে গলবস্ত্র হয়ে আভূমি প্রণত হন মূর্তির চবণপ্রান্তে। অপবাধীব মত কুণ্ঠিত স্বরে বলেন, আমি হীনমতি বালিকা, আমাব কাছে এ ভাব কেন প্রভু?
—আমাব স্বামী কোথা ঠাকুব? তুমিই কি আমাব স্বামী? তা যদি হও আমাব স্বামীব রূপ নিয়ে দেখা দাও। তোমায় আমি শতকোটি প্রণাম কবি।
প্রভুব ঐশ্বর্য অন্তর্হিত হয়। তিনি নতি স্বীকাব করেন প্রেম ও ভক্তিব কাছে। চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন। দ্বিভুজ মহাপ্রভু দুই বাহু প্রসাবিত কবে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বক্ষে টেনে নেন। বলেন বিষ্ণুপ্রিযে! সাধ্বী পতিব্রতে! স্বামীব জন্য তুমি নারায়ণকে উপেক্ষা কবলে? ধন্যা তুমি। তোমাকে আমি ত্যাগ কববো না। লোক-চক্ষে ত্যাগ কবলেও তুমি স্মবণ কবলেই আমি তোমাকে দেখা দিয়ে তোমাব বিবহ বেদনা ঘোচাবো। আব বিরহই প্রেমের মেরুদণ্ড। বিবহ না থাকলে মিলনের কোন স্বাদ থাকতো না। মধু থাকতো না। অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর কোন মূল্য থাকত না।
স্বামীব গাঢ় আলিঙ্গনেব নিচে বিষ্ণুপ্রিযা পাতার মত কাঁপতে থাকেন! বাষ্পোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলেন, আমি তোমার দাসী। সেই আমাব জীবনের পবমার্থ। সেই আমার চরম মর্যাদা। সেই মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। জীবেব মঙ্গলের জন্য তোমার সঙ্গে দুঃখ বরণ করা তো আমার পরম সৌভাগ্য। আশীর্বাদ কর যেন কখনো কোন কারণে তোমার চরণ থেকে আমার চিত্ত বিচলিত না হয়।
মহাপ্রভু সবিনয়ে নত মস্তকে বলেন, তথাস্তু! তোমাকে কখনও বিস্মৃত হবো না। হতে পারবো না। জগতের হিতার্থে দুর্গত জীবের মঙ্গলের জন্য নিজে যে দুঃসহ দুঃখ বরণ করে নিলে সে কথা স্মরণ করে ভাবীকাল তোমার পূজা করবে।

* দ্বাবিংশ পল্লব *

বিদায়ের পালা। নবদ্বীপের আকাশে বাতাসে অনুরণিত হয়ে ওঠে একটা বিদায়ের বিষাদ করুণ রাগিণী। বুকফাটা কান্নার মত। করুণ আর্তনাদের মত।

প্রভু নবদ্বীপ ছেড়ে যাবেন। সেই বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে নবদ্বীপের সর্বত্র। প্রভু একে একে প্রিয়জনদের কাছে বিদায় নিচ্ছেন।

শ্রীনিত্যানন্দের কাছে বিদায় নিয়েছেন। অনুমতি পেয়েছেন শচীদেবীর কাছে। পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। চোখে দেখতে হয়েছে তাঁদের বিয়োগাকুল আসন্ন বিচ্ছেদকাতর বিষাদমলিন মুখগুলি। কানে শুনতে হয়েছে তাঁদের বুকফাটা আর্তধ্বনি। কিন্তু উপায় কি? বিশ্বের কল্যাণে, জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি বলি দেবেন নিজের সুখ সাধ। সমস্ত জাগতিক সুখ বিসর্জন দিয়ে তিনি ভিখারী হবেন। জায়া ও জননীকে কাঙ্গালিনী করবেন। জীবের দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করে দিন যাপন করবেন। পরিধানে কৌপীন মাত্র সম্বল করে অনাবৃত দেহে শীত ও তাপে জর্জরিত হয়ে দূরপথে অভিযান করবেন জগৎ-হিতায়। জীবহিতায়। তিনি বলেছেন কাঁদতেই তিনি এসেছেন। নিজে কেঁদে আর সকলকে কাঁদাবেন। মাকে কাঁদাবেন। কাঁদাবেন সরলা বালিকা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কাঁদাবেন প্রাণাধিক প্রিয় পার্ষদদের। কাঁদাবেন তিনি নবদ্বীপ-বাসীকে। সারা নবদ্বীপকে। কেঁদে কেঁদে যদি তাদের চেতনা হয়। যদি তারা হরিনাম নেয়।

প্রভু এতোদিন নিজে নেচে পরকে নাচিয়েছেন। এইবার নিজে কেঁদে আর সকলকে কাঁদাবেন। তারই উদ্যোগপর্ব চলেছে।

নামমন্ত্র প্রচার করবার জন্য তিনি নিজেকে বিসর্জন দিতে চলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পরিজনদের ও বন্ধু বান্ধবদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন।

আনন্দ-মথিত নবদ্বীপে শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজ করছে। সারা নগরটা যেন একটা অজানা আতঙ্কে মূর্ছিত।

কোলাহল কলরব থেমে গেছে। পথযাত্রীর মুখের হাসি নিভে গেছে। কে যেন তাদের টুটি চেপে ধরে তাদের বাকরোধ করে দিয়েছে। বিসর্পিল রাজপথ ধূলি-ধূসরিত। নিস্তব্ধ। নিঃসাড়। ধারাবাহিক উৎসবান্তে যেন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাছের পাতা নড়ে না। সুরধনী কলধ্বনি করে না। বুকে তরঙ্গ ওঠে না। সময় যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের আবর্তন থেমে আছে। সব যেন শোকে মুহ্যমান। তাদের আনন্দের দিন শেষ হয়েছে। দেবমন্দির শূন্য করে তাদের দেববিগ্রহ চলে যাচ্ছেন। চলে যাচ্ছেন অভিমান করে। হতাদরে।

চিনতে পারল না তাঁকে নদেবাসী। চিনতে পারল না তাঁকে কলি হত জীব। অঞ্জলি ভরে তাদের জন্য দান নিয়ে এসেছিলেন। কল্পতরু হয়ে তাদের বর দিতে চেয়েছিলেন। তারা নিল না। তাঁকে ফিরিয়ে দিল হতাদরে। বীতশ্রদ্ধ হয়ে।

দেবতা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তবু তাদের ভুললেন না। তাদেরই কল্যাণের জন্য, তাদেরই মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে চলেছেন। ভিখারী হতে চলেছেন। নির্জনে বসে তাদের জন্য কাঁদবেন বলে।

নিজে কেঁদে তাদের চোখের জল মোছাবেন। তাদের দুঃখ ঘোচাবেন।

"মেরেছো কলসীর কানা তা বলে কি প্রেম দিব না"—এই যাঁর জীবন-বেদ তিনি প্রেমের জন্য কাঁদবেন বই কি! প্রেমের অমৃতভাণ্ড উজাড় করে দান করতে চেয়েছিলেন। হতভাগ্য দুর্গত জীব তাঁর

কাছে হাত পেতে দাঁড়াল না। 'প্রেম দাও প্রেম দাও' বলে আকুল হয়ে কাতর কণ্ঠে তাঁর কাছে হাত পেতে চাইল না। তাঁকে দুঃখ দিল। তাঁকে কাঁদাল। নিজেরা চোখের জল সার করল। বুক চাপড়ানো ছাড়া আর তাদের কোন পথ রইল না।

—এরা নাম নিল না শ্রীপাদ! নামের মহিমা বুঝলো না।

শ্রীনিত্যানন্দের কাছে প্রভু সকাতর অনুযোগ করেন। এই দুঃখই অভ্রভেদী হয়ে তার মর্মের গভীরে গিয়ে বিঁধেছিল। এই ব্যথাই তাঁকে ধরাশায়ী করে দিল। সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পকে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে তুলল।

তিনি নৈরাশ্যের গভীর তিমির অন্ধকারে পথের সন্ধান করলেন।

দাদার পুঁথি ও তাঁর আদর্শ দিশাহীন অন্ধকারে ক্ষীণ আলোকরশ্মির মত সত্য পথের ইঙ্গিত দিল।

তিনি আলোকিত পথের সন্ধান পেয়ে সঙ্কীর্ণ গলিপথ ছেড়ে বিস্তৃত ও প্রশস্ত রাজপথ ধরলেন।

অভীষ্টের সন্ধান পেয়ে তিনি দৃঢ় পায়ে শক্ত মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্কল্পে দৃঢ় হলেন। সন্ন্যাস। সন্ন্যাসই অভীষ্ট পূরণের একমাত্র পথ। অন্যপথ নাই।

তিনি অটুট সঙ্কল্প নিয়ে মনস্থির করেন এবং সুযোগ সুবিধামত মনোভাব ব্যক্ত করেন। নিত্যানন্দের কাছেই তিনি সর্বপ্রথম স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রিয় পার্ষদদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কিছু স্থির করবেন না। মায়ের অনুমতি নেবেন এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্মত করাবেন।

প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি যাঁদের ভালোবাসেন বা স্নেহের চোখে দেখেন তাদের সকলের সঙ্গেই পরামর্শ করে তাদের

অভিমত জানবেন। সকলের সঙ্গেই শেষ দেখা করে বিদায় নেবেন।

কেউ বাদ যাবে না। নবদ্বীপের গাছপালা, নদী-নালা কীট-পতঙ্গ কেউ বাদ যাবে না। সর্বশেষে নবদ্বীপের মাটির কাছে পর্যন্ত বিদায় নিয়ে তবে তিনি যাত্রা করবেন। কাকেও মনক্ষুণ্ন করে যাবেন না। নবদ্বীপ তাঁর কল্পলোক। নবদ্বীপ ত্যাগ করে গেলেও নবদ্বীপকে তিনি ভুলবেন না।

নবদ্বীপের মাটিতে যে বীজ তিনি বপন করে গেলেন সে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে একদিন বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে। এবং তার ঘনসন্নিবিষ্ট পল্লব ছায়ায় ত্রিতাপদগ্ধ জীব আশ্রয় নিয়ে অমৃতের আস্বাদ পাবে।

এইবার গৌরাঙ্গভক্ত প্রিয় পার্ষদদের কাছে বিদায় নেবার পালা।

"গানের পালা শেষ করে দে
শেষ করে দে রে
যাবি অনেক দূর
বাজে রে বিদায় সুর।"

হাঁ। বিদায়ের সুর বাজছে। শ্রীবাস-অঙ্গনে গান শেষ হয়েছে। কীর্তন শেষ হয়েছে। শ্রীবাস অঙ্গনের স্তব্ধ হাওয়া গুমরে গুমরে কাঁদছে : বিদায় বন্ধু, বিদায়।

প্রভু আসেন শ্রীবাস অঙ্গনে। শেষবার। ভক্ত পার্ষদদের কাছে ডেকে রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, তোমরা আমার প্রিয় বন্ধু! তোমরা আমায় ভালোবেসেছিলে। তোমাদের সঙ্গ দিয়ে সাহচর্য দিয়ে, আমার কীর্তনে সহায়তা করে আমার দিনগুলিকে মধুর করে তুলেছিলে। আমাকে এইবার তোমরা বিদায় দাও বন্ধু! আর আমি তোমাদের কাছে থাকতে পারছি না।

"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবন ভূমি॥"

বলতে বলতে হঠাৎ আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েন। এবং সশব্দে রোদন করতে করতে আপন মনে বলেন, কবে তোমার দেখা পাবো কৃষ্ণ হে প্রাণনাথ? তাঁর মুখভাবে ও অভিব্যক্তিতে ভক্তদের বুঝতে বাকি থাকে না যে তিনি একটা নিদারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছেন। প্রভু রোদন করতে করতে সহসা ভূলুণ্ঠিত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন আর হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ! বলে উচ্চৈস্বরে রোদন করেন। ভক্তেরা বিব্রত হয়ে ওঠেন। সকলে তাঁর চারিদিকে ঘিরে বসেন। গদাধর তাঁর শিয়রে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। প্রভু তাঁর অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় নিস্পন্দ হয়ে থাকেন। ভক্তগণও রোদন করেন। প্রভুর সোনার অঙ্গ ধূলি-মলিন। চোখদুটি রক্তাভ। কণ্ঠে ভাষা নাই। কিছুটা শান্ত হলে ভক্তেরা প্রভুকে ধরাধরি করে মাটি থেকে উত্তোলন করেন।

প্রভু তখন বাষ্পাচ্ছন্ন গদ্‌গদ স্বরে বলেন, তোমরা আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু! তোমরা আমায় বিদায় দাও। আমি যোগীনী হয়ে দেশ দেশান্তরে যাবো আমার প্রাণনাথের সন্ধান করতে। আর আমি তাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না। এতোদিন তোমরা আমায় ধরে রেখেছো। তোমাদের মুখ চেয়েই এতদিন এই দুঃসহ যাতনা সহ্য করেছি। আর পারছি না। তাই বলি আমার ওপর যদি তোমাদের স্নেহ মমতা থাকে, তোমরা আমাকে হৃষ্টমনে বিদায় দাও। তোমাদের কাছে বিদায় নিতে তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাবে, কিন্তু উপায় নেই। আর আমি থাকতে পারছি না।

আবার প্রভুর বক্ষতটে বিরহ রসের ঢেউ ওঠে। সে তরঙ্গ রোধ করা দুঃসাধ্য। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তাঁকে আকুল ও অধীর করে তোলে।

ভক্তদের মনে ভয় হয়। আর রক্ষা নাই। এইবার বুঝি প্রভুকে হারাতে হয়।

'প্রাণ যায়' 'প্রাণ যায়' বলে শোকবিহ্বল হৃদয়ে পার্ষদদের গলা জড়িয়ে ধরেন।

ভক্তগণ কোন কথা বলেন না। নিঃশব্দে রোদন করেন।

প্রভুর মাঝে তখন রাধা-কৃষ্ণের যুগল প্রকাশ। কখনো রাধা কৃষ্ণ বিরহে হা-হুতাশ করেন কখনো কৃষ্ণ রাধা বিরহে আকুল হয়ে কাঁদেন।

কৃষ্ণভাবে প্রভু কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করেন : কোথায় আমার মা যশোদা? কোথায় আমার নন্দ পিতা? কোথায় আমার দাদা বলরাম?

আবার রাধা-ভাবে বলেন, কোথা আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ? কোথা আমার ললিতা বিশাখা, কোথা আমার নিভৃত নিকুঞ্জ?

আমি যে বাসক-সজ্জা রচনা করে তারই অপেক্ষায় বসে আছি। কই কৃষ্ণ? কোথা কৃষ্ণ? নিশি যে পোহায়ে গেল?

স্তম্ভিতের মত ভক্তরা প্রভুর মুখপানে চেয়ে থাকেন। তাঁর মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করেন। তাকে বোঝবার চেষ্টা করেন।

সহসা তাঁর বৃন্দাবনের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি 'বৃন্দাবন' 'বৃন্দাবন' বলে আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠেন। এবং কণ্ঠের উপবীত দুহাতে ছিঁড়ে ফেলে পথে নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকেন।

উপবীত তাঁর বন্ধন। সেই বন্ধনবজ্জু নির্মম হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে সকল বন্ধন মুক্ত হতে চান।

উন্মুক্ত প্রকাশ্য রাজপথে প্রভু ছুটে চলেছেন।

হায়! হায়! করে তাঁর পেছনে ছুটেছেন ভক্তের দল।

বেশী দূর যাবার আগেই প্রভু মূর্ছিত হয়ে ধরাশায়ী হন।

ভক্তেরা তাঁর চারিপাশে বসে তাঁর পরিচর্যা করেন। কেউ মুখে জল সিঞ্চন করেন। কেউ ব্যজন করেন। কেউ কানের কাছে মুখ রেখে

হরিনাম করেন।

গদাধর সযত্নে তার মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে তাঁকে বুকে তুলে নেন।

ভক্তদের সযত্ন শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় প্রভু সম্বিৎ ফিরে পান।

নয়ন উন্মিলন করেন। পরে ভক্তদের সাহায্যে ধীরে ধীরে উঠে বসে স্মিতমুখে বলেন: তোমাদের এই স্নেহ আমার কাল হল। তোমরা এই স্নেহের বাঁধন দিয়ে আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছো। তোমাদের এই অগাধ স্নেহ আমার কৃষ্ণ ভজনের প্রতিবন্ধক। তবুও দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমরা আমায় ধরে রাখতে পারবে না। তোমরা যদি আমার প্রাণ বাঁচাতে চাও, আমায় ছেড়ে দাও। আমি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আসি। এ দেহে তো আমার প্রাণ নেই। এ শূন্যদেহ দেখে তোমরা কী করবে? আমার প্রাণ তো বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মিশে আছে। আর দেহ? দেহ তো কৃষ্ণের বিরহানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ দেহে আর আছে কি? তোমাদের মিনতি করছি। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি বৃন্দাবনে যাই।

প্রভু সরাসরি ভক্তদের কাছে উত্তর চান। তিনি মুখ তুলে প্রশ্নভরা আকুল চোখে তাদের পানে চেয়ে আছেন।

ভক্তেরা প্রমাদ গণল। কী যে বলবে ভেবে পেলেন না।

প্রভু নবদ্বীপ ছেড়ে যাবেন, এ কল্পনাও তাঁদের কাছে মর্মঘাতী। ত্রিভুবন অন্ধকার হয়ে আসে।

কেউ সাহস করে কোন কথা বলতে পারেন না। সাহস থাকলেও কণ্ঠে ভাষা যোগায় না।

শেষে গদাধর তাঁদের পরিত্রাণ করে। গদাধর নির্ভীক। প্রভুর বিশেষ অন্তরঙ্গ। নির্লিপ্তের মত তিনি অকুণ্ঠ ও অবিচলিত কণ্ঠে বলেন, প্রভু সন্ন্যাসী হবেন ক্ষতি কি? আমিও উদাসীন। প্রভু যেখানে

যাবেন, আমিও তাঁর ছায়ার মত পিছু পিছু যাবো। তবে যাবার আগে আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে দাও। আমার মনে খটকা আছে। তোমার মতে কি গৃহে থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করা চলে না? আমার মত কি বলি শোন। তুমি সন্ন্যাসী হলে মাতৃবধের মহাপাতক হবে। সেই মহাপাতকের বোঝা নিয়ে কোন পুণ্য সঞ্চয় করা যায় না। সে প্রচেষ্টা বিড়ম্বনা।

প্রভুর মুখপানে চেয়ে ভক্তদের মনে হয় গদাধর তাঁকে কোনঠাসা করে দিয়েছেন। তাকে ভাবিয়ে তুলেছেন।

প্রভু অকূল সমূদ্রে ভাসছেন।

ভক্তেরা সাগ্রহে তাঁর উত্তরের অপেক্ষায় তাঁর মুখপানে চেয়ে আছেন প্রশ্নাকুল নয়নে।

প্রভু হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে গদাধরের পানে তাকান। তার সেই পরিপূর্ণ দৃষ্টির তলে গদাধর সঙ্কুচিত হন।

প্রভু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত কণ্ঠে বলেন, মর্মে আঘাত দিয়ে কথা বলতে তোমার জোড়া নেই গদাধর। আমার সব চেয়ে দুর্বল ও বেদনাদায়ক ক্ষতস্থান আমার মায়ের চিন্তা। সে চিন্তা আমাকে অহরহ দগ্ধ করছে। তুমি জানো আমার বৃদ্ধা জরাগ্রস্ত জননীই আমার সন্ন্যাসের পথে সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক। তুমি সব জনেশুনে আমার সেই ক্ষতস্থানে আঙুলের খোঁচা দিয়ে সেই ক্ষতকে রক্তাক্ত করে দিলে। এতো নিষ্ঠুর তুমি গদাধর! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। কোথায় তুমি আমায় সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে বলবে। তাঁর দেখাশুনার দায়দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে, না, তুমি তাঁর দোহাই দিয়ে আমাকে আঘাত করছো?

গদাধর! আবেগ কম্পিত কণ্ঠে প্রভু ডাকেন। গদাধর মায়ের কথা মনে হলে আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাই। আমার গৃহত্যাগের সমস্ত বাসনা নিভে যায়। আমি পঙ্গু হয়ে যাই। তোমরা আমায় কৃপা

কর। আমার সহায় হও। আবার গদাধরকে বলেন, যদি আমার ভালোবাসা তোমার হৃদয় আঙিনায় আমার জন্য এতটুকু নরম মাটি থাকে, তা হলে নিজের সুখের জন্য অনর্থক আমার পেছনে না ছুটে আমি যাদের ব্যথা দিয়ে ত্যাগ করে যাচ্ছি তাদের ব্যথা মুছিও। তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিও। তাদের পালন করো। আর যাতে তাদের শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় সেই শিক্ষা দিও। এই আমার ভিক্ষা।

শ্রীবাস একপাশে আনতভঙ্গিতে বসে নিঃশব্দে রোদন করছেন।

প্রভু তাঁর দিকে এবং অন্যান্য ভক্তদের বিষাদ-কাতর মুখের দিকে চেয়ে সান্ত্বনার কণ্ঠে বলেন, প্রাণাধিক বন্ধুগণ! তোমরা শান্ত হও। অধীর হয়ো না। তোমাদের মাঝে আমার গৃহে থাকতে কি সাধ হয় না? তোমাদের এই মধুর সঙ্গ, যা সংসারে দুর্লভ, এবং জননী ও জায়ার স্নেহের সুধা সমুদ্র ছেড়ে যেতে কার সাধ? আমি কি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে যাচ্ছি? না। আমায় তোমরা যেন ভুল বুঝো না। সংসারের প্রতি আমার কর্তব্য আছে। আমি কর্তব্যভ্রষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করছি না। এক অদৃশ্য মহাশক্তি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে শক্তির কাছে আমি একান্ত দুর্বল ও অসহায়। তাঁর কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া আমার গতি নাই। সে প্রবল শক্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই প্রচণ্ড আকর্ষণে আমায় ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীবাস এতোক্ষণ নীরব দর্শক হয়ে বসেছিলেন। এইবার কথা বলেন: তাই হোক প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়। তুমি ঈশ্বর। তোমাকে আমরা ধরে রাখবো কোন শক্তিতে? তুমি যাবে যাও। তবে একটি অনুমতি দাও। আমি বা যে কেউ তোমার সঙ্গে যেতে চায়, সে যেন যেতে পারে।

প্রভু সহাস্যে উত্তর দেন, তোমরা এই ছোট্ট জিনি সটাকে এতো বড়

করে দেখছো কেন? এতো প্রাধান্য দিচ্ছো কেন? ভাবো না, সওদাগরের মত আমি ধনার্জনে দেশান্তরে যাচ্ছি। যা উপার্জন করে নিয়ে আসবো তা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের বিতরণ করবো।

শ্রীবাস উত্তর দেন, ওতে মন প্রবোধ মানে না। তুমি সন্ন্যাসী হয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে গেলে যে প্রাণে বাচবে, তাকে তুমি ফিরে এসে প্রেম-ধন দিও। আমি নিজের কথা বলি। আমি তোমাকে পলকে হারাই। তুমি চলে গেলেই আমি প্রাণে মরবো। সুতরাং তোমার উপার্জনে আমার কি?

মুরারিও একপাশে নীরব দর্শক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

হঠাৎ নিঃস্তব্দতা ভঙ্গ করে বলেন, প্রভু আমরা ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গেরও অধম। কৃপাময় তুমি। দয়া করে আমাদের কিছু ভক্তি দিয়েছো। কিন্তু এখন যদি আমাদের হতাদের দূরে সরিয়ে দাও, সংসার-ব্যাঘ্র আমাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে। নিজের হাতে যে বৃক্ষ রোপণ করলে প্রভু তার মূল উৎপাটন করতে তোমার প্রাণ কাঁদবে না? তোমার মমতা হবে না?

এইবার হরিদাসের পালা। হরিদাস প্রভুর চরণতলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে বলেন, আমার ধন মান বুদ্ধি যশ তোমাকে সব সমর্পণ করলাম। তুমি গ্রহণ কর।

মুকুন্দও এতোক্ষণ স্তব্ধতার অকূলে ডুব দিয়েছিলেন। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি বলেন, প্রভু দেশান্তরী হবেন এ কথা ভাবতেও বুক ফেটে যায়। দেহের রক্ত জল হয়ে যায়। আমাদের প্রাণ বের হচ্ছে না। বের হবার জন্য ছটফট করছে। প্রভু তুমি আমাদের প্রাণ। প্রাণের প্রাণ। তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে এ কল্পনা করতেও মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। মুকুন্দ নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না, উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে ওঠেন।

তার ক্রন্দন সংক্রামিত হয় অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে তাঁরাও কেঁদে ওঠেন।

শ্রীবাস অঙ্গন কান্নার রোলে ভরে যায়। ভক্তেরা তখন নিরূপায় হয়ে একযোগে সকলে প্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে কাতর আর্তনাদ করে, "রক্ষা করো প্রভু! ক্ষমা দাও।"

প্রভু বিস্ময়-বিমূঢ়। হতবাক। এদের শান্ত ও ক্ষান্ত করবার ভাষা খুঁজে পান না। অনেকক্ষণ অশ্রুপূর্ণ কাতর নয়নে ভক্তদের মুখপানে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। পরে ধীরে ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন ভগ্নকণ্ঠে বলেনঃ তোমরা ক্ষান্ত হও। শান্ত হও। আমি তোমাদের। আমার দেহমন তোমাদের। তোমরা আমাকে বেচতে পারো। আমি এখনি এখান থেকেই বৃন্দাবন যাচ্ছি না। আমার এখনো বিলম্ব আছে। তা ছাড়া তোমাদেব একেবারে ত্যাগ করে যাচ্ছি না। তোমাদের মাঝেই আমি থাকবো। তোমরা সর্বক্ষণ আমায় দেখতে পাবে। আমি সেখানে যেভাবে থাকি, তোমরা স্বচ্ছন্দে সেখানে আমাকে দেখতে যেও। আমিও মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাব। যখনই তোমবা সঙ্কীর্তন করবে তখনই আমায় দেখতে পাবে। আমি তোমাদেব মাঝখানে নৃত্য করবো। যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কববেন তিনিই আমায় দেখতে পাবেন।

প্রভু শ্রীবাসকে বলেন, তোমার ঠাকুব মন্দিরে তুমি আমায় সর্বদা দেখতে পাবে। এ আমি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করছি।

শ্রীবাস কাতব কণ্ঠে বলেন, প্রভু তুমি ইচ্ছাময়। তোমার ইচ্ছায় সব অমঙ্গল দূর হয়। তোমাব ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। শুধু দেখো যেন তোমার বিরহে কারুর প্রাণ না যায়। তুমিই আমাদের সকলের প্রাণ।

প্রভু মধুর হাসি হেসে সকলকে কাছে ডেকে একে একে আলিঙ্গন করেন।

প্রভুর শ্রীঅঙ্গের পরশ পেয়ে সকলে ধন্য ও কৃতার্থ হন।

হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু সন্ধ্যার প্রাক্কালে মুরারির বাড়ীতে যান। সেখানে ঠাকুরঘরে বসে মুরারিকে কাছে ডেকে তাঁকে প্রবোধ দেন। বলেন, মুরারি, আমার অভাবে অদ্বৈত আচার্যের আশ্রয় নিও। তাঁর সেবা করো। কৃষ্ণের কৃপা পাবে।

এমনি ভাবে প্রভু প্রায় সকল ভক্তের বাড়ী গিয়ে প্রত্যেককে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেন। দেহের পরশ দিয়ে আলিঙ্গন করেন। যাকে কৃপা করেন প্রভু তাঁকে অকাতরে অজস্র দান করেন।

ভক্তদের মনের সমস্ত ক্ষোভ দুঃখ তিনি নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়ে যেতে চান। তাঁর জন্য যেন তাঁরা কোন দুঃখ না পান। তাই তিনি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আদর আপ্যায়ন করেন।

ভগবান ভক্তের চোখের জল দেখতে পারেন না। ভক্তের কাতরতা তাঁকে কাতর করে। ভক্ত-বৎসল তাঁর নাম।

* ত্রয়োবিংশ পল্লব *

প্রভুর যাত্রাকাল আসন্ন। প্রত্যূষে তিনি গৃহত্যাগ করবেন। ভক্ত ও প্রিয়জনদের চোখের জল মুছিয়ে শান্ত করে তিনি নবদ্বীপের প্রিয় স্থানগুলি শেষবার পরিদর্শন করতে গেলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শীতের কুয়াশা-মলিন বিষণ্ণ সন্ধ্যা।

দুরন্ত হাড় কাঁপানো শীতে প্রভু শেষবার নবদ্বীপ প্রদক্ষিণ করলেন। পথে ঘাটে অলিতে গলিতে সর্বত্র বিচরণ করলেন। কবে কোন বৃক্ষতলে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করেছিলেন, কবে কোন কদম্ব গাছ থেকে ফুল আহরণ করেছিলেন কারুকেই তিনি ভোলেন নি। বৃন্দাবনের শ্যামলী ধবলী ও গো-বৎস দলের মত অসংখ্য স্মৃতির বাহিনী পুচ্ছ তুলে তার পেছনে ছুটে আসে। কাকে ভুলবেন তিনি! সকলের গায়ে একবাব স্নেহের হাত বুলোতে থাকেন।

প্রভু নগর প্রদক্ষিণ শেষ করেন, গঙ্গাতীরে এসে উপবেশন করেন তৃণাচ্ছাদিত নদীতটে। এ স্থানটি মনোরম ও প্রভুর বড় প্রিয়। প্রভুর স্মৃতিমন্দিরে এ স্থানটি বিশেষভাবে চিহ্নিত। এখানে বসে কতদিন পার্ষদদের সঙ্গে কতো আলোচনা ও বিশ্রম্ভালাপ করেছেন। তাদের কতো উপদেশ দিয়েছেন। কতো কৃষ্ণতত্ত্ব শুনিয়েছেন। গঙ্গাস্তব আবৃত্তি করেছেন। সে সব দিনগুলি তার স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করছে। আজ তাঁর শেষ অভিযান। শেষবার তিনি উপবিষ্ট হলেন কলস্বরা সুরধনী কূলে। মাথার উপর অসংখ্য তারকাখচিত অবারিত নীল আকাশ। স্বচ্ছ সলিলা গঙ্গার বুকে আকাশের ছায়া পড়েছে। শীতের গঙ্গা। স্বচ্ছ সলিলা। স্রোতস্বতী। গঙ্গার পরপারে পত্রোশ্যাম তরুশ্রেণী। সবুজ রেখার মত দূর দিগন্তে মিশে গেছে। প্রভু উর্ধ্বমুখে অবারিত আকাশ পানে চেয়ে কি ভাবেন। নিজের

অজ্ঞাতে বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে শূন্যে মিলিয়ে যায়। আবার একবার ঊর্ধ্বনেত্রে নক্ষত্রখচিত নৈশ আকাশের পানে চেয়ে দেখেন।

কী যে দেখেন, কী যে তার দীর্ঘায়ত কমল নয়নপথে ভেসে উঠে তাঁর চোখকে তৃপ্তি দেয় তিনিই জানেন। তবে তাঁর নলিন-নয়ন ছুটি গভীর তৃপ্তিতে জ্বল-জ্বল করতে থাকে। মুখখানি স্নিগ্ধ ও .জ্যাতির্ময় হয়ে যায়। একটা অপরূপ লাবণ্য ঝরে পড়ে জ্যোৎস্নার ধারার মত।

আধ-আধ কণ্ঠে ভক্তদের বলেন, কৃষ্ণ ভজন করো। জীবকে কৃষ্ণ ভজন করতে শিক্ষা দাও। তোমাদের কাছে এই আমার বিদায় বেলার প্রার্থনা।

"ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ। লহ কৃষ্ণের নাম।"

তোমরা গৃহে বসে শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর। আমি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করবো।

শ্রীবৃন্দাবন ছাড়া আর প্রভুর কোন চিন্তা নাই। আর সব তাঁর বিস্মৃতির অন্ধকারে অবলুপ্ত। বৃন্দাবনের ধূলি-কঙ্করময় পথ ঘাট, বৃন্দাবনের যমুনা সৈকত, বৃন্দাবনের বন-উপবন তাঁর মানস-নয়নে প্রতিভাত হয়ে তাঁকে বৃন্দাবনময় করে তুলেছে।

আর সব তিনি ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন নবদ্বীপকে। ভুলে গেছেন শচীদেবী ও প্রাণপ্রিয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ভুলে গেছেন প্রাণাধিক ভক্ত-পার্ষদদের।

বসে আছেন নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে, কিন্তু মন তার বিচরণ করছে যমুনার তটভূমিতে। ভাণ্ডারী বনে। মন তার পাখা বিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণময় শ্রীবৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে। শ্রীমুখে একটি মাত্র বাণী উচ্চারিত: বৃন্দাবনে গিয়ে যেন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে পারি। ব্রজে যেন কৃষ্ণ পাই।

মনের গভীরে তিনি বৃন্দাবন জপ করছেন। মনের আকাশ জুড়ে তাঁর হৃদয়-বৃন্দাবনে তখন কৃষ্ণলীলা চলছে।

সেই পুলিন ভোজন। সেই অঘাসুরের মোক্ষলাভ। সেই ব্রহ্মমোহন লীলা। কালীয়দমন। প্রলম্ব বধ।

বিস্মৃত অতীত তাঁর মনে উত্তাল হয়ে উঠেছে। মন তার উড়ে চলেছে বৃন্দাবনের পথে পথে। শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে তিনি ব্যাকুল ও দিশাহারা।

আকাশের পানে চেয়ে, সুরধনীর পানে যুক্ত-করে প্রণত হয়ে, ভক্তদের আকুল কণ্ঠে বার বার একই কথা বলেন :

"ব্রজে যেন কৃষ্ণ পাই।"

সকলের আশীর্বাদ ও কৃপাভিক্ষা করেন।

সাঙ্গ হল তাঁর শ্রীধাম নবদ্বীপের গঙ্গাতীরের লীলাখেলা। তাঁর শেষ বৈঠক।

মহাকালের পৃষ্ঠায় তাঁর লীলা-কাহিনী সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকেবে ভাবীকালের জন্য। যুগ-যুগান্তের অনাগতদের জন্য। তারই অমৃতময় আস্বাদে তারা ধন্য হবে। তাদের আধ্যাত্ম জীবনের পুণ্য স্মারক হয়ে রইল নবদ্বীপের এই সুরধনী তট।

প্রভু সেখান থেকে এলেন শ্রীবাস অঙ্গনে। শ্রীবাস অঙ্গনে সে রাত্রে অত্যধিক পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ও ভক্তের সমাগম হয়েছে। প্রভুর শেষ কীর্তন হবে নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গনে। দলে দলে লোক এসেছে শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়াকে শেষ দর্শন করতে। তাদের শেষ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে। তাদের শোক-ভারাবনত হৃদয়ের প্রণতি জানাতে। তাদের ইষ্টদেবতার শেষ পূজা করতে। এসেছে পূজার উপচার সঙ্গে করে। সঙ্গে এনেছে শ্রদ্ধার অজস্র উপঢৌকন।

পুষ্প গুচ্ছ। পুষ্প মাল্য। অগুরু চন্দন। কেউ এনেছে ফল ফুলুরী। কেউ এনেছে ক্ষীর ছানা নবনী। কেউ এনেছে রকমারী মিষ্টান্ন।

প্রভু শেষবার শ্রীবাস অঙ্গনের মাটিতে কীর্তন করলেন পরমানন্দে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। বিষণ্ণ ভক্তদের মাঝে আনন্দ সঞ্চারিত করলেন আদরে। আপ্যায়নে। হাসি, কৌতুক ও কীর্তনে। তাঁর শ্রীমুখে বিষাদের ক্ষুদ্রতম রেখাটি পর্যন্ত নাই। বরং তাকে অত্যধিক প্রফুল্ল ও হৃষ্টচিত্ত মনে হল।

কে বুঝবে যে, নিশাবসানে তিনি এই প্রিয়জন পরিবেষ্টিত আনন্দধাম ত্যাগ করে যাবেন। সত্যই তিনি আনন্দঘন। তিনি শোক দুঃখের অতীত। বিষাদ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না।

* চতুর্বিংশ পল্লব *

ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে ভোজন করা প্রভুর দৈনন্দিন ব্যাপার। ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট বা অভুক্ত প্রসাদ নিয়ে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি ভক্তদের এক আনন্দময় অনুষ্ঠান।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। প্রভুর ভোজনের সময় হয়েছে। বাড়ী এলেন প্রভু। নিত্যকার মত ভক্তদল সঙ্গে নিয়ে।

শচীদেবী তখন রন্ধনশালায়। পাক করছেন। বিশেষ আয়োজন করেছেন আজ শচীদেবী। প্রত্যূষে সন্তান বৃন্দাবান যাত্রা করবেন, কাজেই তাকে আজ ভালো করে খাওয়াবেন। এই মায়ের মনের সাধ। এখানেও বহু আহার্য সামগ্রী উপহার এসেছে ভক্তদের কাছ থেকে।

শচীদেবী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাপান্ন ভোগ ও ছত্রিশ ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করেছেন।

উপঢৌকনের মধ্যে ছিল একটি লাউ। শ্রীধর এনেছেন।

ভক্তবৎসল প্রভু বলেন, লাউয়ের পায়স খাবো মা। ভগবান ভক্তকে কৃতার্থ করবেন বইকি।

মা লউয়ের পায়স রাঁধতে বসেন।

মহোল্লাসে ও ঘন ঘন হরিধ্বনির মধ্যে আনন্দ ভোজনপর্ব শেষ হতে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতীত হল।

প্রভু আনন্দে দিশাহারা।

এক চাঁদ শত চাঁদ হয়ে চারিদিকে আন্দরশ্মি বিতরণ করলেন।

মনে জানেন এঁদের আনন্দোৎসব শেষ হল। শেষ রজনীটিকে এঁদের কাছে স্মরণীয় করে রাখতে চান। তারপর এঁদের চোখের জল সার হবে।

প্রভু বিশ্রাম করতে যান শয়ন মন্দিরে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখনো মায়ের কাছে রন্ধনশালায়।

বিস্তৃত পালঙ্কেব উপর পুষ্পাস্তৃত নির্ভাজ নিভৃত শয্যা।

শ্রীমতী নিজেব হাতে রচনা করে রেখেছেন। শিথানের চারিপশে সুগন্ধি ফুলেব মালা। ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে। দীপাধারে স্তিমিত প্রদীপেব স্নিগ্ধ আলো। ঘবের মাঝে আলো-ছায়ার আলপনা। পালঙ্কেব খাঁজে খাঁজে ফুলেব দণ্ড ও গুচ্ছ। কত রঙ-বেরঙের ফুল। শীতেব চন্দ্রমল্লিকা ও গোলাপ।

শয্যাটিকে মনেব মত করে সাজিয়েছেন প্রিয়া। শেষ মিলন রাত্রি বলে কি?

নিশীথ-শীতল শ্বেত-শুভ্র শয্যা প্রভুকে বুকে টেনে নেয়। প্রভু মনে মনে হাসেন।

প্রভুব মনে হয় এতো শয্যা নয়। এ তাঁব প্রেয়সী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তবের ফেনিল কামনা বাসনা। তাঁর অন্তরতম অন্তরের প্রেমোচ্ছ্বাস। প্রভু শয্যাব পানে চেয়ে চেয়ে দেখেন। আকুল নয়নে চোখেব সামনে ভেসে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-কাতর মলিন মুখখানি। অন্তরের গভীরে ফেনিয়ে ওঠে তাঁর বুক-ফাটা কাতর ক্রন্দন। তাঁর আর্তধ্বনি: তুমি বাড়ী ছেড়ে যেও না। আমি বরং বাপের বাড়ী থাকবো। তোমার কাছে আসব না।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁব বুকেব নীচে অভ্রভেদী হয়ে ওঠেন।

শয্যাটার পানে চেয়ে তাঁর মনে হয় এ শয্যা নয়। এ বিষ্ণুপ্রিয়ার আকুল আমন্ত্রণ। এ ফুল নয়, এ প্রিয়ার নয়নের ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে শেষ রাত্রের শীতার্ত বায়ু এসে তাঁকে কাঁপিয়ে তোলে। তাঁর মনে হয় এ বাতাস নয়। প্রিয়ার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। প্রিয়ার প্রতীক্ষায় প্রভু শয্যায় আশ্রয় নেন।

প্রতীক্ষা-কাতর স্তব্ধতা ঘরখানাকে আকুল ও উন্মুখ করে তুলেছে। মৃদু পদপাতের শব্দে চকিত হয়ে ওঠেন প্রভু। বাইরের পানে ঘন ঘন তাকান।

দ্বারদেশে শ্রীমতী অপেক্ষা করছেন নিশ্চল প্রতিমার মত।

একমুখ হেসে প্রসারিত হস্তে প্রভু তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান।

দু'হাত ধরে আকর্ষণ করেন তাঁকে শয্যার প্রান্তে।

নিঃশব্দ হাসি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। সলজ্জ ভঙ্গিতে প্রিয়া উঠে বসেন প্রভুর পদপ্রান্তে। ভাষা যেখানে মূক ভাব-ভঙ্গি সেখানে মুখর ও বাচাল।

ভাবে ভঙ্গিতে, ইঙ্গিতে ঈক্ষণে, লজ্জার আবেশে শ্রীমতী নিজেকে প্রকাশ করেন।

প্রভু সবলে তাঁর গুণ্ঠন মোচন করে দেন।

প্রিয়ার ভুবনমোহিনী রূপের ঝলকে প্রভুর চোখ ঝলসে যায়। তিনি বাণীহীন নিষ্পলক নয়নে তাঁর অনাবৃত মুখ শশী নিরীক্ষণ করেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে।

মুখ নয়। মুখচন্দ্রমা। নিপুণ ভাস্কর খোদিত নিখুঁত মুখ। সে মুখের তুলনা হয় না। ভুরু ও চোখ দুটি তুলি দিকে আঁকা। দীর্ঘ কৃষ্ণ পক্ষ ঢাকা দুটি কমল লোচন। সাগর জলের রঙ সে চোখের অতলে। অদ্ভুত সে চোখের চাহনি।

প্রভু তার চিবুক ধরে মুখখানি নিজের চোখের সামনে তুলে ধরেন। দু'নয়ন ভরে পান করেন সেই রূপ সুধা।

প্রভুর এই গভীর মনোযোগ শ্রীমতীকে লজ্জাভারে অবনত করে দেয়। চোখ তুলে স্বামীর মুখপানে তাকাতে পারেন না। আনন্দে ও আবেশে চোখ জড়িয়ে আসে।

এমন প্রশংসাভরা মুগ্ধ নয়নে আর কখনো প্রভু তাঁকে নিরীক্ষণ করেছেন বলে শ্রীমতীর মনে পড়ে না।

রাত্রি গভীর। বাইরে নিঝুম নিস্তব্ধতার অন্ধকারে রাত্রি শাঁ-শাঁ করছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। সব যেন অনন্ত অখণ্ড নিদ্রামগ্ন।

সারা পৃথিবী যখন ঘুমোচ্ছে ঘুম নেই শুধু বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে। অকাতর অতন্দ্র নয়নে তিনি স্বামীর প্রতি অঙ্গ লেহন করছেন তন্দ্রাহীন নয়নের নিষ্পলক দৃষ্টি দিয়ে।

এক অঙ্গে এতো রূপ। পুরুষের অঙ্গে এত রূপ আর কখনো তাঁর নয়নগোচব হয় নি। বিধাতা যেন তাঁর সৌন্দর্যভাণ্ডার উজার করে তিল তিল আদব-যত্ন দিয়ে এঁকে রূপময় করে তুলেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে হয় অনন্তকাল ধবে এ-রূপ নিবীক্ষণ করলেও চোখের তৃপ্তি হবে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর কণ্ঠে মাল্যদান করেন। দীর্ঘ বিলম্বিত মালতীর মালা। চন্দনের অলকাতিলকা এঁকে দেন প্রশস্ত ললাটে।

প্রভু তাঁর কবরীতে পবিয়ে দেন মালতীর মালা। আদরে সোহাগে চুম্বনে আশ্লেষে প্রভু তাঁকে বিপর্যস্ত করে তোলেন।

শ্রীমতী স্বামীব বক্ষলগ্না হয়ে তাঁর পার্শ্বে শয়ন করেন।

কিছুক্ষণ পরেই গভীর নিদ্রা তাঁকে অচেতন ও নিথর করে দেয়।

রাত্রি বিগত প্রায়।

দূর বনে শেষপ্রহরের ফেরুপাল চীৎকরে করে ওঠে।

নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুম ভেঙ্গে যায় শগালের ডাকে।

চমকে ওঠেন শ্রীমতী।

শৃগালের ডাক অশুভ ও অমঙ্গল বার্তাবাহী।

বুক কেঁপে ওঠে।

এ কি? স্বামী গেলেন কোথায়?

শয্যা হাতড়ে তিনি স্বামীকে খুঁজে পান না।

শয্যার উপর এখনো তাঁর দেহের তপ্ত স্পর্শ রয়েছে। অথচ তিনি নেই। তাঁর স্থান শূন্য।

"শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর।"

—কোথায় তুমি? কোথায় তুমি?

অন্ধকার ঘরের মাঝে অস্ফুট আর্তধ্বনি করে শ্রীমতী হাতড়ে বেড়ান। কেউ শুনতে পায় না সে ধ্বনি। কেউ জানতে পারে না তাঁর অন্তর্বেদনা।

কী যে করবেন তিনি, কী যে করা উচিত ভেবে পান না।

ঘরের মেঝেয় পায়চারি করতে করতে দেখেন ঘরের দোর খোলা।

প্রিয়ার আব বুঝতে বাকি থাকে না যে, প্রভু দোর খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সংজ্ঞাটাও নিঃসংশয়ে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বামী তাঁব অজ্ঞাতসারে তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন।

কান্না পায় বিষ্ণুপ্রিয়ার। তাঁর মনের গহন থেকে সংশয়ের আঁধার কেটে যায়।

"প্রেমেতে বাঁধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া॥"

মনের আশঙ্কা এইবার সত্যের মূর্তি পরিগ্রহ করে দেখা দিল।

ঘরের বাইরে গিয়ে দাওয়ায় দাঁড়ালেন। আবছা অন্ধকারে চারিদিকে অন্বেষণ করেন।

চারিদিক নিস্তব্ধ। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। নাই কোন পদধ্বনি।

শচীদেবী নিজের ঘরে অকাতরে নিদ্রামগ্ন। একবার তাঁর দোরের কাছে গেলেন। তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁকে বিব্রত করিতে ইচ্ছা হল না। ফিরে এলেন।

আকাশ তখনো তিমিরাচ্ছন্ন। দু একটা তারা মিটমিট করে জ্বলছে। আসন্ন আলোর আভাসে পূর্বকাশ কাঁপছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া সেই দিকে চেয়ে করজোড়ে কোন দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করেন তিনিই জানেন।

এক ঝলক দমকা ভোরের বাতাস এসে তাঁর অবিন্যস্ত চূর্ণ অলক দামকে দুলিয়ে দিল। কাঁধ থেকে শাড়ির আঁচলটা খসিয়ে দিল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে ফিরে গেলেন।

ঠিক সেই কালে, শীতের সেই শেষ রাত্রে প্রভু গঙ্গার জলে অববগাহন করে পরপারে উত্তীর্ণ হলেন এবং কাটোয়ায় কেশব ভারতীর আশ্রম অভিমুখে রওনা হলেন।

ঘুমন্ত শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও ঘুমন্ত নবদ্বীপধামকে ত্যাগ করে প্রভু সন্ন্যাসের পথে পদার্পণ করলেন।

তখনো দিনের আলো ফোটেনি। পশু পাখি জাগেনি।

—মা! মা! মাগো! ওঠো মা!

শচীমাতার দোরে মৃদু করাঘাত করে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঘুমন্ত শচীমাতাকে জাগিয়ে তোলেন।

—কী মা? কী হয়েছে প্রিয়া? নিমাই কই?

শচীদেবী উঠে বসেনশ য্যাপ্রান্তে। প্রদীপ জ্বালেন। তারপর দোর খুলে দাঁড়ান।

—এতো ভোরে? ব্যাপার কি প্রিয়া? উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করেন শচীদেবী।

—মা গো!—মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

—কী হয়েছে রে? নিমাই ভাল আছে তো?

ভগ্নরুদ্ধ কণ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর দেন,

"শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা-অন্তে কোথা গেল,
মোর শিরে বজর হানিয়া।"

বধূর সংবাদে মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। উন্মাদিনীর মত আলুথালু কেশে এবং অসম্বৃত বেশে সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করে নিমাইকে খোঁজেন।

কিন্তু কোথায় নিমাই ?

নিমাই তখন রাত্রি শেষের স্তিমিত অন্ধকারে, নদী-নালা বন-বাদাড়-পার হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে পদব্রজে ঘুমন্ত কাটোয়ার পথে চলেছেন।

মনের দৃঢ় সঙ্কল্প দৈহিক সুখ দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

তন্ন তন্ন করে বাড়ীর অন্ধি-সন্ধি তল্লাস করে যখন নিমায়ের কোন সন্ধান পেলেন না, তখন শচীদেবী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আলো হাতে পথে বের হলেন তাঁর নয়নমণি নিমায়ের সন্ধানে।

কিন্তু কোথায় তাঁর নিমাই ? নিমাই তখন দূরপথের যাত্রী।

নৈশ স্তব্ধতার বুকে কশাঘাত করে শচীদেবী ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক দেন —নিমাই ! নিমাই !

বৃদ্ধার জরাজীর্ণ ক্ষীণ কণ্ঠ নিথর নিস্তব্ধ নৈশ বায়ুস্তর ভেদ করে বেশীদূর অগ্রসর হয় না।

পেছনে তার বস্ত্রাঞ্চল ধরে ধীরপায়ে তাঁর অনুসরণ করছেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

দুজনেরই নয়ন অশ্রু পরিপ্লুত। দুজনেরই দেহ শোক ও ভয়ে অবশ হয়ে আসছে।

দুজনাই উৎকণ্ঠায় রুদ্ধশ্বাস। চলবার শক্তি তাদের লোপ পাচ্ছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই। তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে গেছেন প্রভু। তাঁদের প্রাণশক্তি শুষে নিয়ে গেছেন।

—নিমাই! নিমাই! প্রাণপণ শক্তিতে শচীদেবী আকুল আর্তনাদ করেন।

শীতার্ত ভোরের বায়ুস্তরে সে শীর্ণ স্বর বিলীন হয়ে যায়।

সে কাতর আর্তধ্বনি ঘুমন্ত নগরীর কর্ণগোচর হয় না। একটা নিষ্ফল হাহাকারের মত শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে ধূলি-ধূসারিত পথে মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আকর্ষণ করে বলেন, মা! আমিও ডাকি! তুমিও ডাক।

বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীব অসহায়তায় ব্যথিত হন। কুলবধূ তিনি। পথিমধ্যে চীৎকার করা অশোভন মনে হয়।

জনবিরল পথ। নৈশ অন্ধকারে আবৃত।

কিন্তু তিনি ডাকেন কি বলে?

শচীদেবীকে প্রশ্ন করেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

শচীদেবী উত্তর দেন:

"তুমি ডাক প্রাণনাথ বলিয়া
আমি ডাকি নিমাই বলিয়া॥"

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া প্রকাশ্য রাজপথে কোন শব্দ করলেন না। তাঁর কণ্ঠ রইল অনুচ্চারিত।

শচীদেবী ঊর্ধ্বশ্বাসে আকুল হয়ে ডাকেন—নিমাই! নিমাই!

সে স্বর ঘুমন্ত নগরের বুকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে,—নাই! নাই! আসন্ন প্রভাত দিগন্তের বুকে আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়ে। গাছের মাথায় পাখির কূজন কলরব শোনা যায়।

পথে লোক চলাচল শুরু হয়। প্রত্যূষে স্নানার্থীর দল গঙ্গার ঘাটে চলেছে। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ীর দোরে এসে দাঁড়ান।

দলে দলে লোক আসছে তাঁদের বাড়ীর দিকে। শচীদেবী আকুল উৎসুক নয়নে তাদের দিকে চেয়ে দেখেন।

তাদের মাঝে খোঁজেন একটি পরিচিত মুখ। আরেকবার কাতর স্বরে ডাকেন,—নিমাই! নিমাই!

শীতের আর্ত বাতাস হাহারবে কেঁদে ওঠে—নিমাই! নিমাই!

জটলা বেঁধে লোকগুলো তাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসে।

শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রশ্ন করেন, ওরা কারা? ওরা কি আমার নিমাইকে ধরে নিয়ে এলো?

বিষ্ণুপ্রিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন: না মা। সে আর আসবে না' তাকে ধরে আনতে কেউ পারবে না। 'জীবের লাগি' তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন।

মূর্ছাহতের মত শচীদেবী দ্বারপ্রান্তে ভেঙ্গে পড়েন।•

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নেন।

প্রত্যহের মত সেদিনও সকালে স্নান করে দলে দলে ভক্তেরা আসেন শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করতে।

এসে দেখেন:

"গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥"

— শেষ —